পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

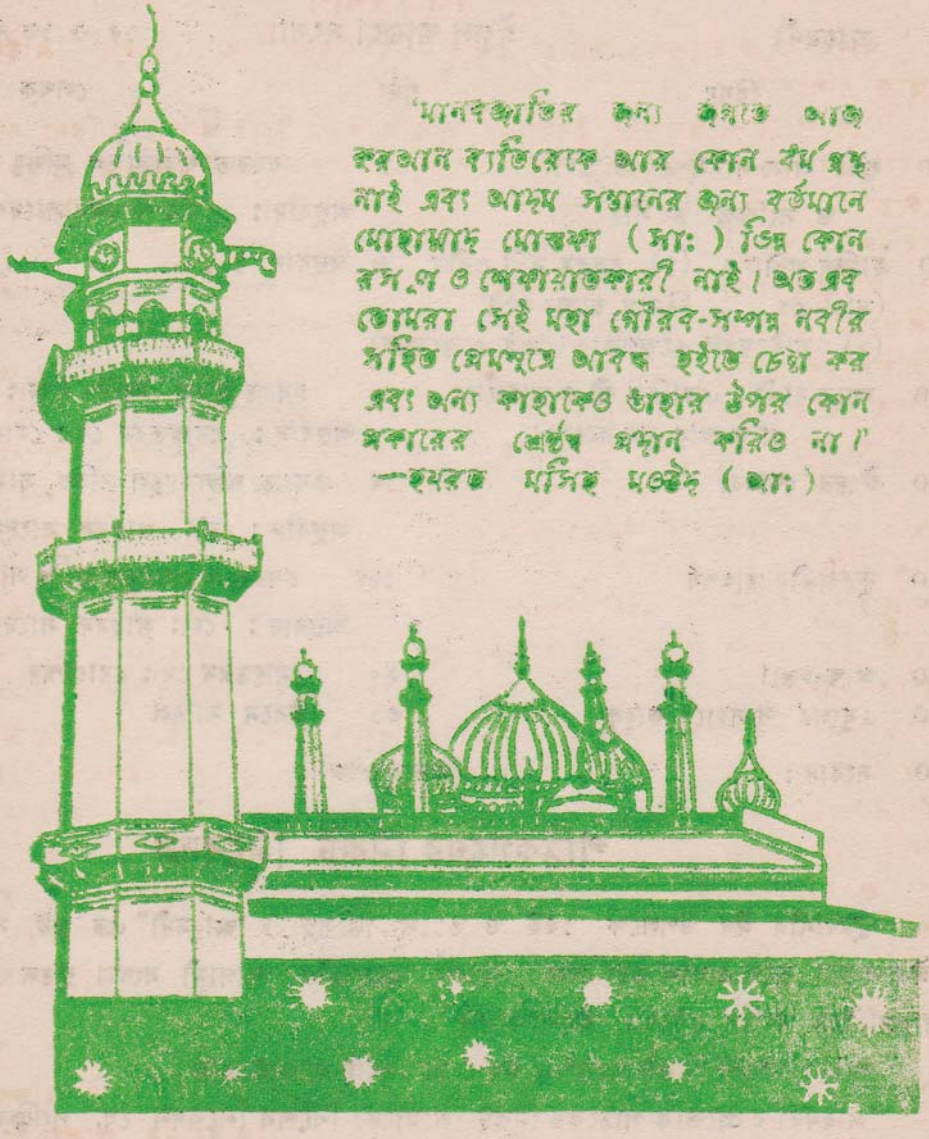

'মানবজাতির জন্য কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।'
—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ১৪শ সংখ্যা

৫-শে অগ্রহায়ন, ১৩৮১ বাংলা : ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭৪ ইং : ১লা জিলহজ্জ, ১৩৯৪ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহমদী | ঈদুল আজহা সংখ্যা | ২৮শ বর্ষ ১৫ ও ১৬ শ সংখ্যা

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
০ সুরা আল-শামস্-এর তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফসীর	১	হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ
০ হাদিস শরীফ : (১) হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর বিদায় হজ্জের বাণী (২) সাইয়েদুল এস্তেগফার (শ্রেষ্ঠ এস্তেগফার)	৬	অনুবাদ : ,, ,, ,, ,,
০ অমৃত বাণী : একাধিক স্ত্রী ও তাহাদের প্রতি ন্যায় সম ব্যবহার	৮	হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মোহতরম মৌঃ মোহাম্মাদ,
০ ঈদের খোৎবা	১৫	হযরত খলিফাতুল মসিহ সানী (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ
০ কুরবানীর তাৎপর্য	১৮	হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ
০ আত্ম-হত্যা	২০	মোহতরম মৌঃ মোহাম্মদ
০ এযুগের আসহাবে কাহ্ফ	৩১	ইবনে সাবিল
০ সংবাদ :	(কভার পেজ)	

পাঠকগণের নিকট নিবেদন

কুরবানীর ঈদ উপলক্ষে ১৫ই ও ৩১শে ডিসেম্বরের 'আহমদী" এর দুই সংখ্যা একত্র 'ঈদ সংখ্যা' রূপে প্রকাশ করা গেল। এরপর 'আহমদীর' আগামী সংখ্যা নুতন বৎসরের ১৫ই জানুয়ারীতে বাহির হইবে। ইনশাআল্লাহ্।

আমরা সকলের নিকট আন্তরিক ঈদ মোবারকবাদ জানাইতেছি।

'আহমদী'র প্রত্যেক পাঠকের নিকট আমাদের বিশেষ নিবেদন যে, পাক্ষিক আহমদীর বাৎসরীক চাঁদা সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করুন।

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلى على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
পাক্ষিক
আ হ ম দী
নব পর্য্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ১৫ ও ১৬শ সংখ্যা :
৩০শে অগ্রহায়ন, ১৩৮১বাং : ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭৪ইং : ১৫ই ফাতাহ, ১৩৫৩ হিজরী শামসী :

সুরা আল শামস্

তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফ্সীর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৪)

[হযরত মুসলেহ্ মওউদ খলিফাতুল মসিহ্ সানী (রাঃ) প্রণীত তফসীরে সগীর এবং তফসীরে কবীর হইতে সংক্ষেপিত ও অনুদিত]

—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

তরজমা ঃ

১২। "সামুদ জাতি তাহাদের সীমাতিরিক্ত ঔদ্ধত্তের জন্য (যুগ-নবীকে) প্রত্যাখ্যান করিয়াছে,

১৩। সেই সময়ে, যখন তাহাদের মধ্যকার সব চাইতে হতভাগ্য ব্যাক্তি (সেই যুগ-নবীর) বিরোধিতায় তৎপর হইয়া উঠে।

১৪। তখন তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র রসুল (সালেহ্) বলিলেন যে, আল্লাহ্‌র (উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত) উষ্ট্রীটির ব্যাপারে সাবধান হও, এবং উহাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সকল প্রকার ঔদ্ধত্ত হইতে বিরত থাক।

তফসীর ঃ

আলোচ্য আয়াত সমূহের মধ্যে সুরা গাশিয়ার আয়াত "আমেলাতুন নাসেবাতুন" এর মধ্যে বর্ণিত বিষয় বস্তুর দিকে ইশারা রহিয়াছে অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা এখন সুপরিকল্পিত ও সংগবদ্ধ ভাবে বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করিবে। আলোচ্য সুরায় সেই বিষয় সম্পর্কীয় একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলা হইতেছে যে, যেভাবে সামুদ জাতি যথাবিহিত ভাবে নেতা নিযুক্ত করিয়া বিরোধীতা করিয়াছিল, তেমনিভাবে বর্তমান অবিশ্বাসীরাও সেইরূপই করিবে। সুতরাং তাহাদের মধ্যে 'আশকান নাস'—সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি যেভাবে হযরত সালেহকে তবলীগ হইতে বাধা দান করিয়াছিল, তেমনি তোমরাও শীঘ্রই সেইরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে এবং ইসলামকে তোমাদের সমষ্টিগত শক্তির দ্বারা উৎখাৎ করার প্রয়াস পাইবে। কিন্তু স্মরণ রাখিও যে, তাহারা যেভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল এবং খোদাতায়ালার আজাবের শিকারে পরিণত হইয়াছিল, তেমনি

ভাবে তোমরাও এই মোকাবেলায় কখনও সফল হইতে পারিবে না।

ইহা একটি তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, মানুষ তাহা বুঝিতে পারে নাই। তাহারা মনে করিয়াছে যে, সেই উষ্ট্রীর মধ্যে কোন বিশেষ গুণ ও মর্যাদা ছিল এবং উহার পাগুলি কাটিয়া দেওয়াতেই সামুদ জাতি আল্লাহ্‌র আজাবের শিকারে পরিণত হইয়াছিল। সেজন্য কোন কোন তফসীরকারক উক্ত উষ্ট্রীর সম্বন্ধে এই আশ্চর্য কথা লিখিয়াছেন যে, পাহাড় হইতে উহা জন্ম লাভ করিয়াছিল। উহা অন্যান্য উটের মত ছিল না। অথচ নবীর বর্ত্তমানে ইহা কিরূপে সম্ভব ছিল যে, নবীকে নির্যাতন করার কারণে তো সেই জাতির উপর আজাব আসে না. বরং উষ্ট্রীর পা কাটিয়া দেওয়াতে আজাব আসে?

আসল কথা এই যে, হযরত সালেহ্ (আঃ) আরব দেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং আরব দেশে উটের উপর চাপিয়া মানুষ সফর করিত। হযরত সালেহ্ (আঃ) ও উটের উপর চাপিয়া চতুর্দিক বিভিন্ন জায়গায় তবলীগের জন্য যাইতেন। মানুষ হযরত সালেহ্ (আঃ)-কে তাঁহার গোত্রের জন্য প্রকাশ্যভাবে নির্যাতন করিতে ভয় পাইত। তাহারা মনে করিত যে, যদি তাহারা সালেহ্ (আঃ) কে সরাসরি কষ্ট দেয়, তাহা হইলে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত হইবে। কিন্তু যেহেতু তাঁহার তবলীগ করাও তাহাদের মোটেই সহ্য হইত না, সে জন্য তাহারা তাঁহাকে কষ্ট দেওয়ার কতক অন্য পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল। উহাদের মধ্যে একটা অন্যতম পন্থা ছিল এই যে, যখন হযরত সালেহ (আঃ) তবলীগের উদ্দেশ্যে চতুর্দিকের এলাকায় গমণ করিতেন তখন সেখানকার লোক তাঁহার উষ্ট্রীর পানি বন্ধ করিয়া দিত অথবা উহাকে খাইতে দিত না। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, এই ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইলে, হযরত সালেহ্ (আঃ)-এর তবলীগ নিজে নিজেই বন্ধ হইয়া যাইবে। হযরত সালেহ্ (আঃ) তাহাদিগকে বুঝাইলেন যে, তোমরা এই উষ্ট্রীকে স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করিতে দাও এবং উহার পানি পানে বাধাদান করিও না। কেননা ইহাতে আমার তবলীগের কাজে বিঘ্নের সৃষ্টি হইবে। তাঁহার বলার এই অর্থ ছিল না যে, তোমরা আমাকে তোমাদের নিকটে আসিতে না দিলও এই উষ্ট্রীকে বাধা দিও না বরং উহা তোমাদের নিকট আসিলে উহাকে পানি পান করিতে বা খাইতে দিও'। আসলে উষ্ট্রীর প্রতি তো তাহাদের কোন শত্রুতা ছিল না। তাহাদের আক্রোষ ছিল একমাত্র হযরত সালেহ্ (আঃ)-এর প্রতিই এবং তাহারা মনে করিত যে, তিনি উষ্ট্রীর উপর চাপিয়া চারিদিকে আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করিয়া এক আলোড়ন সৃষ্টি করেন এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র আদেশা-

বলীর অনুবর্ত্তীতার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন, এইরূপ হইতে দেওয়া উচিত নয়।' এই বিষয়টিই ছিল, যাহা তাহাদের নিকট অসহ্য এবং বিষবৎ বলিয়া মনে হইত এবং তাহারা ইহার প্রতিকার স্বরূপ এই পন্থা অবলম্বন করিল যে, হযরত সালেহ্ (আঃ) তবলীগের উদ্দেশ্যে বাহির হইলে তাহারা তাঁহার উষ্ট্রীকে কোথাও পানি পান করিতে দিত না। ইহাতে হযরত সালেহ্ (আঃ) তাহাদিগকে বুঝাইয়া এবং সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন 'নাকাতাল্লাহে ওয়া সুক্ইয়াহা'—অর্থাৎ, তোমাদের এই পন্থা ঠিক নয়। তোমরা আমার উষ্ট্রীকে স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করিতে দাও এবং উহার পানি পানে বাধা দান করিও না, অর্থাৎ তোমরা বিভিন্ন পন্থায় আমার প্রচার কার্যে বাধ সাধিও না এবং আমাকে স্বাধীনভাবে চলিতে দাও, যাহাতে আমি খোদাতায়ালার বাণী সকল মানুষের নিকট পৌঁছাইতে পারি। মোটকথা, উষ্ট্রীটিকে বাধা দেওয়া সমুদ জাতির উদ্দেশ্য ছিলনা বরং হযরত সালেহ্ (আঃ)-কে বাধা হইতে বিরত রাখাই তাহাদের আসল লক্ষ্য ছিল সেজন্য সামুদ জাতির প্রতি হযরত সালেহ্ (আঃ)-এর সাবধানবাণী উচ্চারণের উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, "তোমরা আমার তবলীগের কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিও না। যদি তোমরা আমার উষ্ট্রীকে পানি পান করিতে বাধা দান করিতে থাক, তাহা হইলে আমার তবলীগ বন্ধ হইয়া যাইবে এবং উহার ফলে জনবসতি সমূহ হেদায়েত লাভে বঞ্চিত থাকিবে।"

হযরত সালেহ্ (আঃ)-এর বুঝানো সত্ত্বেও সামুদ জাতি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে নাই। "তাহারা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং উষ্ট্রীর পাগুলি কাটিয়া দেয়"—অর্থাৎ, প্রকাশ্যে তাহাদের ইচ্ছা ও সংকল্পের কথা ঘোষণা করে এবং বলিয়া দেয় যে, তুমি যাহা কিছুই বল না কেন, আমরা তোমাকে তবলীগ করিতে দিব না।

[সুরা নামালের ৪র্থ রুকুতে আছে যে, সামুদ জাতি হযরত সালেহ্ (আঃ)-এর উষ্ট্রীকেই বধ করে নাই বরং তাঁহাকেও সম্মিলিত যোগসাজসের মাধ্যমে হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছিল এবং এই অপরাধ হইতে সরাসরি ভাবে দায়মুক্ত থাকার উদ্দেশ্যে তাহারা তাহাদের নয়জন 'আয়েম্মাতুল-কুফর'—প্রধান নেতৃবর্গের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত এবং পারস্পরিক সহযোগীতার মধ্য দিয়া হযরত সালেহ্ (আঃ)-কে হত্যা করার ব্যর্থ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিল; যেমন, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর হিজরত কালে মক্কাবাসী কাফেরগণ একই উদ্দেশ্যে অনুরূপভাবেই একজোট হইয়া তাঁহাকে হত্যা করার ব্যর্থ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিল। বিস্তারিত অবগতির জন্য পাঠ করুন তফসীর-কবীরের ৫ম খণ্ড ৩য় পৃঃ অংশ। —অনুবাদক]

ফাদামদামা আলাইহিম রাব্বুহুম বেযাম্বেহিম্— "আল্লাহ্ তাহাদের পাপের জন্য তাহাদের উপর ধ্বংস অবতীর্ণ করিলেন।"

دمدم الشيء (দামদামাশ্ শাইয়া)-এর অর্থ

হয় الزقه بالارض উহাকে ধূলিস্যাৎ করিল, ধ্বংসস্বরূপ পরিণত করিল। دمدم الله عليهم (দামদামাল্লাহু আলাইহিম)-এর অর্থ হয় اهلكه খোদাতায়ালা তাহাদিগকে ধ্বংস করিলেন এবং دمدم فلان على فلان এর অর্থ হয় كلمه مغضبا তাহার সহিত অগ্নি মূর্ত্তিতে কথা বলিল। (আকরাবল মওয়ারেদ)।

فدمدم عليهم ربهم بذنبهم আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন যে, যেহেতু তাহারা আমার রসুলের কথা মনে নাই, সেজন্য আমি তাহাদের উপর আজাব অবতীর্ণ করি এবং আজাবও এমন কঠোর যে, 'ফাসাওয়াহা'—খোদাতায়ালা তাহাদিগকে জমীনের সহিত মিলাইয়া দেন, তাহাদের ছোট-বড় সকলকেই এমন ভাবে ধ্বংস করিয়া দেন যে, তাহাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত দুনিয়াতে অবশিষ্ট থাকিল না।

কুরআন করীমের মধ্যে যে কত উচ্চ পর্যায়ের মাধুর্যপূর্ণ বাকভঙ্গী রহিয়াছে, তাহা এস্থলেও লক্ষ্যণীয়। প্রথমে আল্লাহ বলিয়াছিলেন, "ওয়া নাফ্‌সিও ওয়া মা সাওয়াহা"—অর্থাৎ, আমি মানব আত্মার 'তাসবিয়া' تسويه সাধিত করিয়াছি—উহাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পরস্পর তারতম্যরক্ষাকারী শক্তি সমূহ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছি এবং মানবাত্মা স্বয়ং ইহার সাক্ষ্য দান করে যে, আসমান হইতে তাহার জ্যোতি লাভের আবশ্যক। এখন আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন যে, যেহেতু তাহারা উক্ত 'তাসবিয়া' (تسويه) এর কদর করে নাই এবং আমার আদেশাবলী গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছে, সেহেতু আমি তাহাদের ভিন্ন প্রকারে তাসবিয়া সাধিত করিলাম অর্থাৎ, তাহাদিগকে ধূলিস্যাৎ করিয়া জগৎ হইতে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করিয়া দিলাম। ইহা ভাষাগত চরম মাধুর্যের একটি দৃষ্টান্ত যে, যে বিষয় তাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়া ছিল, উহার ফলশ্রুতি হিসাবে আজাবের অর্থেও সেই শব্দই রাখা হইয়াছে। তাহারা 'নফ্‌সের তাসবিয়া' সাধন করিতে অস্বীকার করিয়াছিল, আল্লাহ্‌তায়ালা সেই শব্দটিই আযাবের জন্য ব্যবহার করিয়াছেন ('ফা সাওয়াহা')। অর্থাৎ, আল্লাহ্ বলেন যে, যেহেতু তাহারা 'তসবিয়া'-কে অস্বীকার করিয়াছিল, সেইহেতু আমি তাহাদের এই ভাবে 'তাসবিয়া' সংঘটিত করি যে, তাহাদের দেশ ধ্বংস করিয়া দেই; তাহাদের ঘড়-বাড়ী ও অট্টালিকা সমূহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করি, তাহাদের জাতিকে পর্যুদস্ত করিয়া দেই এবং এমন প্রচণ্ড 'ভূমিকম্প' আসে, যাহার আঘাতে তাহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

১৭। "ওয়ালা ইয়াখাফু উকবাহা"।

'উকবাহা'-এর মধ্যে হা (ها) সর্বনাম 'দামদামাহ্'-কে নির্দেশ করে এবং আয়াতের অর্থ এই হয় যে, যখন 'দামদামাহ্' বা ধ্বংস অবতীর্ণ হওয়ার সময় উপস্থিত হয় এবং কোন জাতি তাহাতে সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার উপযোগী হয়, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা ইহা দেখেন না যে, যাহারা তাহাদের সহিত সম্বন্ধ রাখে তাহাদের কি অবস্থা ঘটিবে এবং

সেই আজাব বা শাস্তির পরিণতি কেমন ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করিবে। কোন কোন সময় গোটা জাতি ধ্বংস হয় না বরং উহার কিছু অংশ ধ্বংসের কবল হইতে বাঁচিয়া যায় কিন্তু তাহারা দুনিয়াতে চরম লাঞ্ছনা ভোগ করে। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন যে, যখন আমার তরফ হইতে কোন জাতির সম্পর্কে ধ্বংসের সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হয়, তখন আর আমি ইহার কোন পরোয়া করি না যে, ঐ জাতির মধ্যে অব্যাহতি প্রাপ্ত ব্যক্তিরা কি কি দুঃখ কষ্ট পোহাইবে। যখন জাতির অধিকাংশ লোক খোদাতায়ালার গজব ও কহরের উপযোগী হয় এবং তাহাদের মধ্যে নিরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণকারীগণ যদিও বিরুদ্ধাচরণ বা অত্যাচার করে না, তথাপি নবীর পক্ষও সমর্থন করে না, তখন ইহারাও প্রকাশ্য অন্যায় ও অত্যাচারে লিপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মধ্যেই পরিগণিত হইয়া এক সাথেই ধ্বংস ও বিনাশের শিকার হয়। ইহার এই অর্থ নয় যে, আল্লাহ্‌তায়ালা জুলুম করেন বা নির্বিচারে আজাব পাঠাইয়া দেন, বরং কোন জাতির ধ্বংস ও মূলোৎপাটন সম্পর্কে তাঁহার ফায়সালা সম্পূর্ণ ন্যায় সঙ্গত ভাবেই হইয়া থাকে এবং যখন তাহারা নিজেদের পরিণামের প্রতি নিজেরাই দৃষ্টিপাত করে না, তখন আল্লাহতায়ালাও কেনই বা তাহাদের পরিণতির প্রতি দৃকপাত করিবেন?

এই আয়াতের এই অর্থও হইতে পারে যে, যেহেতু মক্কার কাফেরগণও সমুদ জাতির মতই নবীর মোকাবেলা করিতেছে, সেইহেতু তাহাদেরও স্মরণ রাখা উচিত যে, সমুদকে ধ্বংস করার সময়ে যেমন আল্লাহতায়ালা সর্বগ্রাসী আজাব নাযেল করিয়াছিলেন, তেমনি তিনি মক্কাবাসীদের উপরও এক সর্বগ্রাসী আজাব নাযেল করিবেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, সমুদ জাতি সার্বিক ধ্বংসের মধ্য দিয়া বিলুপ্ত হইয়া ছিল, কিন্তু মক্কাবাসীরা রসুল করীম (সাঃ)-এর বিজয় লাভের পরও বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে আপত্তির কিছু নাই। কেননা, কোন কোন সময় বিলুপ্তি জাগতিক না হইয়া আধ্যাত্মিক হইয়া থাকে। সমুদ জাতি জাগতিক ও পার্থিব ভাবে সামগ্রিক ধ্বংসের মাধ্যমে বিলুপ্ত হয় এবং মক্কাবাসীরা আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় বিপ্লবের মাধ্যমে তাহাদের বিলুপ্তি ঘটায়। সুতরাং তাহাদের নিজস্ব ধর্ম, কৃষ্টি, আচার, অনুষ্ঠান এবং প্রভাব প্রতিপত্তির নাম-গন্ধও অবশিষ্ট থাকে না এবং ইসলামের মধ্যে তাহাদের আত্মিক বিলোপ সংঘটিত হয়।

হাদিস শরীফ

(১)

হযরত নবী করীম (সাঃ) এর বিদায় হজ্জের বাণী

"হে মানব সকল! আমার বাণী শুনো! কেননা, আমি জানি না, পরবর্ত্তী বৎসর আমার হজ্জ করার সুযোগ ঘটিবে কি না।

(মুসলিম ও আবু দাউদ)

নিশ্চয় আল্লাহ্ বলেন যে, হে মানব সকল! আমরা তোমাদিগকে পুরুষ ও নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন পরিবার বা বংশ এবং গোত্র বা জাতিতে এজন্য বিভক্ত করিয়াছি যে, তোমরা যেন পরস্পর পরিচিত হইতে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক তাকওয়াশীল (নেক্কার) সে-ই আল্লাহ্র নিকট অধিক সম্মানিত। সেজন্য তকওয়ার কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে কোন আরবী কোন আজমী হইতে অথবা কোন আজমী আরবীর উপর শ্রেষ্ঠ নয়; তেমনি ভাবে কোন ফর্সা ব্যক্তি কোন কালো ব্যক্তি হইতে অথবা কোন কালো ব্যক্তি কোন ফর্সা ব্যক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ নয়। হে কুরেশগণ! এমন না হউক যে, তোমরা কেয়ামতের দিন দুনিয়ার বোঝা তোমাদের কাঁধে বহণ করিয়া উপস্থিত হও এবং অন্যান্য মানুষ আখেরাতের সামান লইয়া উপস্থিত হয়; যদি ঐরূপ হয়, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্র আজাব হইতে বাঁচাইতে পারিব না।

হে মানব সকল! তোমাদের প্রাণ ও জীবন এবং তোমাদের ধন ও সম্পদ তোমাদের পরস্পরের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত ঠিক সেইরূপ সম্মানজনক যেরূপ আজিকার দিন (ইউমুল আরফা) এবং এই মাস (জিলহাজ্জ) এই পবিত্র (মক্কা) নগরীতে সম্মানজনক।

(বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ)।

এবং নিশ্চয়ই, তোমরা সত্বর তোমাদের রবের সহিত মিলিত হইবে; তখন তোমাদের রব্ব তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন। আমি তোমাদিগকে আমার বাণী পৌঁছাইয়া দিলাম। যে ব্যক্তির নিকট কোন আমানত গচ্ছিত হয় সে ব্যক্তির কর্ত্তব্য উহা হকদারের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া।"

(মুসনাদ আহ্মদ)।

সাইয়েদুল এস্তেগফার

(শ্রেষ্ঠ এস্তেগফার)

হযরত শদ্দাদ বিন অউস হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন : সাইয়েদুল এস্তেগফার (বা শ্রেষ্ঠ ক্ষমা-প্রার্থনা) এই যে, তুমি নিম্নরূপ বলিবে :

اللهم انت ربى لا اله الا انت
خلقتنى و انا عبدك و انا على عهدك
و وعدك ما استطعت و اعوذ بك
من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك
على و ابوء بذنبى فاغفرلى فانه
لا يغفر الذنوب الا انت -

(অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তুমি আমার রব্ব —সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তুমি ব্যতীত কোন এলাহ্—উপাস্য, লক্ষ্য, কাম্য এবং ভক্তি ও আনুগত্যের যোগ্য নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ এবং আমি তোমার বান্দা—উপাসক বা দাস এবং আমি আমার সাধ্যানুসারে তোমার সহিত আবদ্ধ অঙ্গীকারে ও ওয়াদায় কায়েম আছি। আমার কৃতকর্মের কুফল হইতে আমি তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করি। আমার প্রতি তোমার বিপুল অনুগ্রহ স্বীকার করি। তেমনি আমার পাপ ও ত্রুটি-বিচ্যুতিও স্বীকার করিতেছি। সুতরাং তুমি আমার মাগফেরাত কর—আমার পাপ ক্ষমা কর, উহার কুফল এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা হইতে রক্ষা কর। কেননা, তুমি ব্যতীত আর কোন ক্ষমাকারী বা রক্ষাকরী নাই।) নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি দিনের বেলায় পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত এই দোয়া চাহিবে, সে যদি সেই দিনে সন্ধ্যার আগমনের পূর্বেই মৃত্যু বরণ করে, তাহা হইলে সে জান্নাতবাসীগণের অন্তর্ভূক্ত হইবে। এবং যে ব্যক্তি রাত্রিকালে পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত উক্ত দোয়া আল্লাহ্‌র নিকট চাহিবে, সে যদি প্রভাত হইবার পূর্বেই সেই রাত্রে মৃত্যু বরণ করে, তাহা হইলে সেও জান্নাতবাসীগণের অন্তর্ভূক্ত হইবে।

(বুখারী, মেশকাত, বাবুল এস্তেগফার ওয়াত্‌তাওবাহ্)।

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এর

অমৃত বানী

একাধিক স্ত্রী ও তাহাদের প্রতি সম ন্যায় ব্যাবহার

একাধিক স্ত্রীর প্রতি সম ব্যবহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) বলেন :

"প্রেমের কথা বাদ দিয়া, কার্যত : সকল স্ত্রীকে সমানভাবে রাখিতে হইবে। বেশভূষা, পানাহার, সামাজিকতা ও সহ-অবস্থান বিষয়েও সমতা রক্ষা করিতে হইবে। এই অধিকারগুলি এমন যে ইহাদের সম্বন্ধে মানুষ যদি পূর্ণ জ্ঞান রাখিত, তাহা হইলে সে চিরকুমার থাকা পছন্দ করিত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ মানিয়া চলে, সেই উক্ত দায়িত্ব পালনে সক্ষম। সেই প্রকারের সম্ভোগ, যাহার ফলে আল্লাহ্‌তায়ালার শাস্তি দণ্ড মাথার উপর সদা সমুচ্চ থাকে, তাহার পরিবর্তে তিক্ত জীবন কাটানো হাজার গুণে শ্রেয়।

একাধিক স্ত্রীর সম্বন্ধে যে আমি শিক্ষা দিই, উহা এই জন্য যে মানুষ যেন পাপ পথে পদস্খলন হইতে বাঁচিয়া যায়। শরীয়ত এ ব্যবস্থা চিকিৎসারূপে রাখিয়াছে। যদি মানুষ দেখে যে প্রবৃত্তির তাড়ণা ও কাম উত্তেজনায় তাহার দৃষ্টি বার বার খারাপ হইতেছে তখন ব্যভিচার হইতে বাঁচিবার জন্য সে দ্বিতীয় বিবাহ করিয়া লইবে। কিন্তু প্রথম স্ত্রীর অধিকারকে খর্ব করিবে না। তৌরাত হইতেও ইহা সাব্যস্ত আছে যে, তাহার অধিকতর মনঃস্তুষ্টি করিবে। কারণ যৌবনের সুদীর্ঘ সময় তাহার সহিত যাপন করিয়াছে এবং স্বামীর সহিত তাহার এক গভীর সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রথম স্ত্রীর প্রতি মনোযোগ ও তাহার মনঃস্তুষ্টি সাধন এরূপ পর্যায়ের হওয়া উচিৎ যে, কোন পুরুষ যদি দ্বিতীয় বিবাহের প্রয়োজন অনুভব করে, অথচ দেখে যে, ইহাতে তাহার প্রথম স্ত্রীর শক্ত কষ্ট হইবে এবং তাহার হৃদয় দুঃখে ভাঙিয়া পড়িবে, এমতাবস্থায় সে যদি ধৈর্য ধারন করে এবং কোন বিপদে না পড়ে, এবং তাহার দ্বারা শরীয়তের কোন বিধান ভঙ্গের কাজ না হয় এবং এই প্রেক্ষিতে তাহার প্রয়োজনাবলীকে স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য কুরবানী করে এবং এক স্ত্রী লইয়া জীবন কাটাইয়া দেয়, তাহা হইলে কোন ক্ষতি নাই এবং তাহার কর্তব্য হইবে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ না করা।

আমার দিল চাহে যে, আমার জামাতের লোক একাধিক বিবাহ করুক এবং বহু সন্তান সন্ততির দ্বারা জামাতের সংখ্যা বৃদ্ধি করুক, কিন্তু শর্ত এই যে দ্বিতীয় স্ত্রী অপেক্ষা প্রথম স্ত্রীর প্রতি অধিকতর ভাল ব্যবহার করিবে, যেন তাহার মনে কষ্ট না হয়। প্রথম স্ত্রী দ্বিতীয় স্ত্রী আনা এই জন্য দেখিতে পারে না যে, সে মনে করে যে, তাহার প্রতি মনোযোগ এবং তাহার অধিকার ক্ষুন্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু আমার জামাতের লোকের এইরূপ করা উচিৎ নহে। যদিও স্ত্রীলোকগণ এই কথায় নারাজ হয়, তথাপি আমি এই শিক্ষাই দিব যে এই শর্ত সংযুক্ত থাকিবে যে দ্বিতীয় স্ত্রী অপেক্ষা প্রথম স্ত্রীর প্রতি মনোযোগ এবং তাহার অধিকার অগ্রগণ্য থাকিবে এবং ইহা কার্যকরী রাখিতে হইবে। দ্বিতীয় স্ত্রী অপেক্ষা প্রথমাকে বেশী সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে। নচেৎ এমন না হয় যে, পূণ্যের বদলে আযাব হইয়া যায়। খ্রীষ্টানগণেরও ইহার প্রয়োজন হইয়াছে।

খোদাতায়ালার নিকট হইতে আমি যাহা কিছু জানিয়াছি উহা পক্ষপাত শূন্য হইয়া বলিতেছি। কুরআন শরীফে একাধিক স্ত্রী অনুমতির উদ্দেশ্য এই যে তোমরা নিজেদের প্রবৃত্তিকে তকওয়ার উপর কায়েম রাখ, নেক সন্তান সন্ততি লাভ কর এবং নিজেদের ও আত্মীয়-স্বজনের অধিকার পালন করিয়া পূণ্য সঞ্চয় কর। এই সকল উদ্দেশ্যেই এক, দুই, তিন এবং চারি স্ত্রী পর্যন্ত গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যদি ন্যায় বিচার কায়েম রাখিতে না পার তাহা হইলে ইহা পাপ হইবে এবং পূণ্যের স্থলে আযাব অর্জন করিবে। এক পাপের প্রতি ঘৃণা করিয়া অন্য পাপে লিপ্ত হইবে। মনে কষ্ট দেওয়া শক্ত পাপ। মেয়েদের সম্বন্ধ অত্যন্ত কোমল হইয়া থাকে। পিতামাতা যখন তাহাদিগকে নিজেদের নিকট হইতে ছিন্ন করিয়া অন্যের নিকট সমর্পন করিয়া দেয়, তখন চিন্তা করিয়া দেখ তাহারা মনে কত আশা ভরসা লইয়া আসে। ইহার ধারনা عاشروهن بالمعروف (তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর) আদেশ হইতে প্রতীয়মান হইবে। যদি কাহারও ব্যবহার তাহার স্ত্রীর প্রতি ভাল হয় এবং শরীয়ত অনুযায়ী তাহার দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে তাহা হইলে তাহার স্ত্রী ইহাতে বাধ সাধিবে না। আমি আপন গৃহেই দেখিয়াছি যে আমার স্ত্রী (হযরত নুসরত জাহান বেগম) (মোহাম্মদী বেগমের সহিত) আমার নেকাহের ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ হওয়ার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া দোয়া করিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে স্ত্রীগণের আপত্তির বড় কারণ হইল স্বামীর কামুকতা। যদি তাহারা বুঝিতে পারে যে, তাহাদের স্বামী সাঠিক ও তকওয়ার কারণে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে চাহে, তাহা

হইলে তাহারা কখনও অসম্মত হয় না। ফসাদের ভিত্তি তকওয়া বিরোধী কাজ।

আল্লাহ্‌র আইনকে ইহার উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে কখনও কাজে লাগাইবে না এবং ইহার দ্বারা এরূপে ফায়দা গ্রহণ করিবে না, যাহাতে কেবল কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার এক উপকরণ লাভ হয়। স্মরণ রাখিও এরূপ করা পাপ। খোদাতায়ালা বার বার বলিয়াছেন যে, কাম যেন তোমাকে অভিভূত করিতে না পারে। বরং তোমার প্রত্যেক কাজের উদ্দেশ্য হইবে তকওয়া। যদি শরীয়তকে ঢাল বানাইয়া কাম পূজার জন্য একাধিক বিবাহ করা হয়, তাহা হইলে ইহার ফলশ্রুতি ইহাই হইবে যে বিজাতিগণ কুসমালোচনা করিবে যে বহু বিবাহ করা ছাড়া মুসলমানগণের আর কোন কাজই নাই। ব্যাভিচার করাই পাপ নহে বরং কামচিন্তায় হৃদয় বিভোর হওয়াও পাপ। মানব জীবনে পার্থিব সম্ভোগের অংশ খুবই কম হওয়া উচিৎ যাহাতে

فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا

"কম হাঁসো এবং বেশী কাঁদো" আয়াতের প্রতীক হও। কিন্তু যাহার পার্থিব সম্ভোগ বেশী এবং রাত্রি দিন স্ত্রীদের লইয়া যে মশগুল থাকে, তাহার কাঁদিবার সময় কোথায়? অধিকাংশ লোকের এই অবস্থা। তাহারা এক খেয়ালের পিছনে সব আয়োজন করে এবং এই ভাবে খোদাতায়ালার নির্ধারিত উদ্দেশ্য হইতে দূরে সরিয়া যায়। খোদা-তায়ালা যদিও কতকগুলি জিনিষকে জায়েয করিয়াছেন কিন্তু তাহার অর্থ ইহা নহে যে. উহার মধ্যেই জীবন কাটাইয়া দিবে। খোদা তায়ালা তাঁহার বান্দাগণের গুণ বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, يبيتون لربهم سجدا و قياما "তাহারা তাহাদের রবের জন্য সারা রাত্রি সেজদা এবং কেয়ামের মধ্যে কাটায়।" এখন দেখ, দিবা-রাত্রি স্ত্রীগণের সহিত বিলাস বিহারে মগ্ন ব্যক্তির সম্ভোগোপযোগী রাত্রি কিভাবে এবাদতে কাটিবে। সে এমনভাবে স্ত্রীগণকে লইয়া কাটায়, যেন সে খোদার শরীক সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে।

হযরত নবী করিম (সাঃ)-এর পবিত্র আদর্শ

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নয় স্ত্রী ছিলেন। ইহা সত্বেও তিনি সারা রাত্রি খোদার এবাদতে কাটাইতেন। এক রাত্রি আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহে তাঁহার থাকার পালা ছিল। কিছু রাত্রি অতিবাহিত হইলে, আয়েশা (রাঃ)-এর ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি দেখিলেন আঁ-হযরত (সাঃ) গৃহে নাই। তাঁহার সন্দেহ হইল, হয়ত তিনি অন্য কোন স্ত্রীর গৃহে গিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক স্ত্রীর গৃহে যাইয়া অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু তাহার সন্ধান পাইলেন না। অনেক তালাশের পর দেখিলেন তিনি কবরস্থানে। সেখানে তিনি সেজদায় পড়িয়া কাঁদিতেছেন। এখন লক্ষ্য কর, তিনি জীবিত ও আকাঙ্খিত স্ত্রীকে ছাড়িয়া মৃতগণের

কবর স্থানে গিয়া কাঁদিতেছিলেন। অতঃপর কে বলিতে পারে যে তিনি কাম-সম্ভোগ বা বিলাসের জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং খুব ভাল করিয়া মনে রাখিও যে খোদাতায়ালার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, কাম যেন তোমাদিগকে অভিভূত করিয়া না ফেলে। যদি তকওয়াকে পূর্ণতা দান করিবার জন্য সত্যকার প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আরও বিবাহ করিতে পার। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পার্থিব ভোগের অবস্থা এই ছিল যে, একবার হযরত উমর (রাঃ) যখন তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলেন এবং এক বালক মারফৎ অনুমতি চাহিলেন, তখন তিনি খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শয়ন করিয়া ছিলেন। যখন হযরত উমর (রাঃ) ভিতরে প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি উঠিয়া বসিলেন। হযরত উমর (রাঃ) দেখিলেন সারা ঘর শুন্য পড়িয়া রহিয়াছে এবং গৃহে কোন সাজ সজ্জার উপকরণ নাই। একটি খুঁটিতে একটি তলোয়ার ঝুলিতে ছিল এবং সেই চাটাই শয্যাটি ছিল, যাহার উপর তিনি শুইয়া ছিলেন। এবং উহার ছাপ তাঁহার মোবারক পৃষ্ঠ দেশে বিরাজ করিতেছিল। ইহা দেখিয়া হযরত উমর (রাঃ) কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে উমর, তুমি কি দেখিয়া কাঁদিলে? হযরত উমর (রাঃ) বলিলেন, কিসরা ও কায়সার আয়েশ আরামের আসবাবের অধিকারী অথচ আপনি খোদার রসুল এবং দুই জাহানের বাদশাহ, আপনি এইরূপ অবস্থায় আছেন? আঁ-হযরত (সাঃ) বলিলেন, হে উমর, দুনিয়া লইয়া আমি কি করিব? আমি সেই মুসাফেরের ন্যায় কাল কাটাইতেছি, যে উষ্ট্র পৃষ্ঠে সওয়ার হইয়া গন্তব্যের দিকে চলিয়াছে এবং মরু পথে দারুন গরমে কোন গাছ দেখিয়া উহার ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করে। অতঃপর যেমনি গায়ের ঘাম শুকাইয়া যায়, অমনি সে আবার যাত্রা শুরু করে। যত নবী এবং রসুল আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই দ্বিতীয় দিক (আখেরাত)-কেই সদা দৃষ্টির সম্মুখে রাখিয়াছিলেন।

অতএব জানা উচিৎ যে, যে ব্যাক্তি কাম-সম্ভোগের জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে, সে ইসলামের মগজ হইতে দুরে থাকে। যতদিন এবং রাত্রি আসে, সে যদি তিক্ততার সহিত জীবন যাপন না করে এবং কম কাঁদে অথবা একেবারেই কাঁদে না এবং বেশী হাঁসে তাহা হইলে স্মরণ রাখিও সে ধ্বংসের লক্ষ্যস্থল হইয়াছে। কাম-সম্ভোগ হালালভাবে হইলে ক্ষতি নাই। যেমন টাট্টু ঘোড়ায় সওয়ার কোন ব্যক্তি উহাকে পথে চারা ইত্যাদি দেয় এই জন্য যে উহার শক্তি যেন অক্ষুন্ন থাকে এবং তাহাকে সে যেন গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। যেখানে আল্লাহতায়ালা সর্ব প্রকার হক রাখিয়াছেন সেখানে তিনি নফ্‌সেরও হক রাখিয়াছেন, যাহাতে সে এবাদত করিতে পারে। লোকচক্ষুতে চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি

পাপ, অথচ তাহারা ইহা জানে না যে কাম সম্ভোগে মগ্ন থাকাও পাপ। যদি কোন ব্যক্তি তাহার অধিকতর সময় আয়েশ-আরামে যাপন করে এবং কোন এক সময়ে উঠিয়া চার ঠোকর মারিয়া লয় অর্থাৎ নামায পড়ে, তাহা হইলে সে নমরুদী জীবন যাপন করে। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর রেয়াজত এবং কষ্ট করা দেখিয়া খোদাতায়ালা বলিয়াছিলেন, তুমি কি এইরূপ নেহনতে প্রাণ বিসর্জন দিবে অথচ তোমার জন্য স্ত্রীগণকেও হালাল করিয়াছি। এ কথা খোদাতায়ালা তাঁহাকে ঠিক সেইভাবে বলিয়াছিলেন, যেমন মা নিজের সন্তানকে পড়াশুনা এবং অপরাপর কাজে নিমগ্ন দেখিয়া স্বাস্থ্য রক্ষার্থে তাহাকে খেলা ধুলা করিবার অনুমতি দিয়া থাকে। খোদাতায়ালার এইরূপ সম্ভাষণের উদ্দেশ্য ইহাই যে নূতন উদ্যম লইয়া যে তিনি দীনের খেদমতে রত হইতে পারেন। ইহার এ অর্থ কখনই নহে যে তিনি যেন কাম-সম্ভোগে ঝুঁকিয়া যান। মূর্খ কু-সমালোচক বিষয়টির একটা দিক দেখে এবং অপর দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করে না। পাদরীগণ কখনও এইদিকে দৃষ্টিপাত করে নাই যে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সত্যকার আকর্ষণ কোন দিকে ছিল এবং দিবারাত্রি তিনি কি চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। বহু মোল্লা এবং সাধারণ ব্যক্তি এই সূক্ষ্ম বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞ। যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে তোমরা কামনার দাস হইয়াছ, তখন তাহারা উত্তর দেয় যে আমরা কি হারাম করিতেছি, শরীয়ত আমাদিগকে অনুমতি দিয়াছে। আমি তাহাদিগকে বলি, তোমরা ইহা জানো না যে, অস্থানে হালালের ব্যবহারও হারাম হইয়া যায়।

وما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون

"জিন ও মানবকে সৃষ্টি করা হয় নাই বরং এবাদতের জন্য" আয়াত হইতে ইহা সুপ্রকাশিত যে মানবকে কেবল এবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। সুতরাং এই উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্য তাহার যতটুকু প্রয়োজন, উহার অধিক গ্রহণ করিলে, জিনিষ হালাল হইলেও বাহুল্যের কারণে উহা তাহার জন্য হারাম হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি দিবারাত্রি কামনা চরিতার্থে লিপ্ত থাকে, সে এবাদতের হক কতটুকু বজায় করিতে পারিবে? মোমেনের জন্য ইহা জরুরী যে, সে তিক্ত জীবন যাপন করিবে। কিন্তু সে যদি আয়েশ-আরামে জীবন যাপন করে, তাহা হইলে সে জীবনের এক-দশমাংশও লাভ করিতে পারিবে না। আমার কথার তাৎপর্য এই যে, উভয় দিক বজায় করিতে হইবে। এ নহে যে বাসনা কামনা চরিতার্থ করার দিকে বেশী জোড় দিবে এবং তকওয়াকে সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করিবে। ইসলাম যে সকল কাজকে মোবাহ বলিয়াছে উহার কখনই এ অর্থ নহে যে দিবারাত্রি উহাতে ডুবিয়া থাকিবে। ইহার অর্থ ইহাই যে, প্রয়োজন

ও সময় অনুযায়ী। উহা হইতে উপকার লাভ কর।"

প্রশ্নকারী এই সময়ে বলে, "তাহা হইলে একাধিক বিবাহ ঔষধ স্বরূপ নহে।" হুজুর (আঃ) বলেন, 'হাঁ'। প্রশ্নকারী তখন জিজ্ঞাসা করে, "আমাদের খবরের কাগজে যে লিখিতেছে আহমদী জামাতের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য একাধিক বিবাহ কর।" হুজুর (আঃ) বলিলেন:

"এক হাদীসে আছে যে একাধিক বিবাহ দ্বারা বংশ বৃদ্ধি কর, যাহাতে উম্মত বাড়ে। প্রকৃত কথা হইল انما الاعمال با النيات আমল নিয়তের উপরে। মানবের সকল কাজের কেন্দ্র হইল তাহার নিয়ত। কাহারও হৃদয়কে আমরা চিরিয়া দেখিতে পারি না। যদি কাহারও এই নিয়ত না হয় যে বহু বিবাহ করিয়া সে কাম-সম্ভোগে বিলীন হইয়া যাইবে বরং নিয়ত এই হয় যে, এতদ্বারা দীনের খাদেম পয়দা হউক, তাহা হইলে ক্ষতি কি? কিন্তু ইহাও শর্ত সাপেক্ষ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যদি কাহারও চারি স্ত্রী থাকে এবং প্রত্যেকক স্ত্রী হইতে প্রত্যেক বছর একটি সন্তান হয়, তাহা হইলে চার বৎসরে ১৬টি সন্তান হইবে। কিন্তু ঘটনা এই যে মানুষ বিষয়ের অপর দিগকে পরিত্যাগ করিয়া বসে। তাহারা চাহে যে বিষয়টির এক দিকেই (অর্থাৎ বংশ বৃদ্ধির দিকেই) জোর দেওয়া হউক। কিন্তু আমার কথা কখনই ইহা নহে। কুরআন শরীফে বিভিন্ন ভাবে তকওয়ার নির্দেশ আছে। কিন্তু যেখানে যেখানে স্ত্রীগণ সম্বন্ধে কথা আছে, সেখানে নিশ্চয় তকওয়ার নির্দেশ আছে। হক দেওয়া অত্যন্ত জরুরী বিষয়। এই জন্য আদল (ন্যায় বিচার)-এর তাকীদ আছে। যদি কেহ দেখে যে সে হক আদায় করিতে পারে না অথবা তাহার পুরুষত্ব দুর্বল অথবা রোগাক্রান্ত হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার কর্তব্য সে যেন জানিয়া শুনিয়া নিজেকে আযাবে না ফেলে। তকওয়া অর্থাৎ শরীয়ত অনুযায়ী প্রয়োজন যদি স্বস্থানে বর্তমান থাকে, তাহা হইলে প্রথম স্ত্রী নিজেই তাহার স্বামীকে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের প্রস্তাব দিবে যে সে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করুক। আমার শেষ নসিহত ইহাই যে ইসলামকে নিজেদের আয়েশের জন্য ঢাল বানাইও না। এরূপ করিবে না যে আজ এক সুন্দরী মেয়ে দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া ফেলিলে, কাল আর এক জনকে দেখিয়া, তাহাকেও বিবাহ করিয়া ফেলিলে। ইহা তো খোদার গদিতে স্ত্রীগণকে বসাইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া যাওয়ার মতো।

ধর্ম ইহাই চাহে যে হৃদয়ে যেন এমন যখম থাকে, যদ্বারা সদা খোদা স্মরণ হয়। নচেৎ ঈমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। যদি সাহাবা বহু বিবাহ করিয়া তাহাদিগকে লইয়া মগ্ন থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা যুদ্ধে কিভাবে নিজেদের মস্তক দিতেন। তাঁহাদের অবস্থা এইরূপ ছিল যে এক আঙ্গুল কাটিয়া গেলে বলিতেন, এক আঙ্গুলই তো গিয়াছে, ইহাতে কি হইয়াছে? কিন্তু যাহার হৃদয় দিবারাত্রি কাম বিলাসে মত্ত, সে কোথা হইতে এই প্রকার হৃদয় আনিবে? আঁ-হযরত (সাঃ) নামাযে এত বেশী কাঁদিতেন এবং খাড়া থাকিতেন যে, তাঁহার পা স্ফীত হইয়া যাইত। সাহাবা বলিতেন, খোদা

আপনার সকল ত্রুটি ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন; কেন আপনি এরূপ কষ্ট করেন এবং কাঁদেন? তিনি উত্তর দিতেন, "আমি কি আল্লাহ্‌র শুকুর গুজার বান্দা হইব না?"

কোন ব্যক্তি আপত্তি করে যে ইসলামে চারি স্ত্রী গ্রহণের ব্যবস্থা বড়ই খারাপ এবং ইহা সকল প্রকার বদ আখলাকের উৎস। হযরত আকদাস মসিহ মওউদ (আঃ) উত্তর দেন:

"চারি স্ত্রী গ্রহণের হুকুম দেওয়া হয় নাই। ইহা এক অনুমতি যে চারি পর্যন্ত রাখিতে পারিবে। ইহা দ্বারা সাব্যস্ত হয় না যে চারিজনকেই গলার ঢোলক বানাইয়া লও। কুরআনের উদ্দেশ্য ইহাই যে যেহেতু মানুষের প্রয়োজন বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে, সেই জন্য এক হইতে চারি জন পর্যন্ত অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি যে একদিকে নিজের পক্ষ হইতে আপত্তি পেশ করে এবং অপর দিকে ইসলামের দাবী ও করে, আমি জানি না তাহার ঈমান কিভাবে কায়েম থাকে? সে তো ইসলামের বিরুদ্ধবাদী। সে প্রণিধান করে না যে একজন আইন প্রণয়নকারীকে আইনকে বানাইবার সময় কতদিকে নজর রাখিতে হয়। এখন ধর, যদি কাহারও এক স্ত্রী থাকে এবং স্ত্রীর কুষ্ঠ রোগ হয় অথবা সে প্রমেহ রোগাক্রান্ত হয়, অথবা অন্ধ হয় অথবা তাহার দ্বারা সন্তান না হয় ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী বেচারা কি করিবে? সে কি এই প্রকার স্ত্রী লইয়া কষ্ট থাকিবে? বিরুদ্ধবাদী এই রূপ বিপদের অবস্থায় কি সমাধান দিবে? অথবা তাহার স্ত্রী দুশ্চরিত্রতা হইয়া ব্যভিচার করে, তাহা হইলে কি তাহার আত্ম-মর্যাধাবোধ ঐরূপ স্ত্রীকে পূর্ণ সতীত্বের আখ্যা দিয়া রাখিবে? খোদা জানেন এই সকল লোক ইসলামের বিরুদ্ধে দোষারোপ করিবার সময় কেন অন্ধ হইয়া যায়। আমি বুঝি না, যে ধর্ম মানবের প্রয়োজন মিটাইতে পারে না, সে আবার ধর্ম কিসের? উপরে বর্ণিত অবস্থা সমূহে খ্রীষ্ট ধর্ম কি সমাধান দিবে? কুরআন শরীফের মাহাত্ম ইহাই যে মানবের এমন কোন প্রয়োজন নাই, যাহার সম্বন্ধে ইহা পূর্ব হইতে আইন বানাইয়া না দিয়াছে। এখন ইংলণ্ডেও এইরূপ অসুবিধার জন্য একাধিক বিবাহ ও তালাকের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। ইদানিং সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, একজন লর্ড দ্বিতীয় বিবাহ করিয়াছে। ইহাতে তাহাকে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে কিন্তু সে আমেরিকা চলিয়া যাইতেছে।

গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখ মানুষের জন্য এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হয় কিনা, যখন তাহার একাধিক বিবাহ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। যদি এইরূপ প্রয়োজনের উদ্ভব হয়, অথচ ইহার প্রতিকার না থাকে, তাহা হইলে ইহাই সেই ত্রুটি, যাহা দূর করিবার জন্য কুরআন শরিফকে পূর্ণ কেতাব হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছে।"

(ফাতাওয়ায়ে হযরত মসিহ্ মওউদ আঃ)

অনুবাদঃ মৌঃ মোহাম্মদ,
আমীর, বাঃ আঃ আঃ

ঈদের খোৎবা

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

আমাদিগকে এক প্রকৃত এবং পূর্ণ ঈদের সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে, এবং উহা এই যে, সমগ্র মানবজাতি হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর পতাকার নীচে একত্রিত হইবে।

আমাদের চেষ্টা এবং দোয়া করা উচিত, খোদাতায়ালা যেন আমাদিগকে আমাদের জীবদ্দশায় সেই প্রকৃত ও পূর্ণ ঈদ দেখার সৌভাগ্য প্রদান করেন।

১লা শওয়াল (মোতাবেক ১৮ই এখা, ১৩৫৩ হিঃ শাঃ এবং ১৮ই অক্টোবর, ১৯৭৪ইং) জুমার দিনে রবওয়ায় ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী অনাড়ম্বর এবং অত্যন্ত গাম্ভির্য পূর্ণ ভাবে ঈদুল ফিৎর উদযাপিত হয়। সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) মসজিদে-আকসায় ঈদের নামাজ পড়ান এবং একটি অত্যন্ত ঈমান বর্ধক খোৎবা প্রদান করেন। উহার মধ্যে তিনি এ বিষয়ের উল্লেখ করেন যে, প্রকৃত ও পূর্ণ ঈদ সেই দিন হইবে যে দিন আল্লাহ্ প্রদত্ত সুসংবাদ সমূহ অনুযায়ী সমগ্র মানব জাতি নবী আকরাম (সাঃ)-এর ঝাণ্ডার নীচে আসিয়া একত্রিত হইবে। অতঃপর তিনি এই কথার উপর জোর দেন যে, এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আমাদের যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ ও চেষ্টা করা এবং দোয়া করা উচিত যে, খোদাতায়ালা যেন তাঁহার এই শুভ সংবাদ সমূহ শীঘ্র পূর্ণ করেন এবং আমাদিগকে আমাদের জীবদ্দশায় সেই প্রকৃত ও পূর্ণ ঈদ দেখার সৌভাগ্য দান করেন।

ঈদের নামাজে রবওয়াবাসীগণ হাজার হাজার সংখ্যায় শরীক হন। রবওয়ার বাহিরের বিভিন্ন স্থান হইতেও বন্ধুগণ তাঁহাদের ইমাম (আইঃ)-এর অনুবর্ত্তিতার ঈদের নামাজ আদায়ের জন্য মোটর কার এবং স্পেশাল বাসে করিয়া রাবওয়ায় আগমন করেন। ইহার ফলে মসজিদ উহার অসাধারণ প্রশস্ততা সত্বেও মুসল্লীগণের দ্বারা ভরিয়া যায়।

হুজুর আকদাস (আইঃ) নামাজ পড়াইবার পর এক ঈমান উদ্দীপক ঈদের খোৎবা এরশাদ করেন। হুজুর তাশাহুদ ও তায়াউজ এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর খোৎবার শুরুতে বলেন: আজ ঈদ। আল্লাহ্তায়ালা আপনাদিগের জন্য এই ঈদ মোবারক করুন। আজ সেই ঈদ যাহা পবিত্র রমজান মাস এবং উহার নির্দিষ্ট এবাদত সমূহের পর

আসিয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের সেই সকল এবাদত কবুল করুন এবং আমাদিগের জন্য প্রকৃত ঈদের সামান করুন। আজ সেই ঈদ যাহা দোয়ার কবুলিয়তের নির্ধারিত সময়ের পর আসিয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের সেই সকল দোয়া যাহা আমরা উক্ত সময়ের মধ্যে চাহিয়াছি, কবুল করিয়া আমাদের জন্য সত্যকার ও প্রকৃত আনন্দের উপকরণ সৃষ্টি করুন। আজ ঐ ঈদ যাহা সেই সকল দোয়ার পরে আসিযাছে যাহা আমরা নিজেদের দেশের অগ্রগতি, সমৃদ্ধি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য চাহিয়াছি। আল্লাহ্‌-তায়ালা যেন আমাদের ঐ সকল দোয়া কবুল করেন এবং আমাদের দেশ এবং দেশবাসীকে, —আমরাও যাহাদের অন্তর্ভূক্ত, সত্যিকার আনন্দ নসীব করেন। আজ সেই ঈদ যাহা জগতের পরিত্রাণ (নাজাত), সমৃদ্ধি ও সুখ-শান্তির সহিতও সম্বন্ধ রাখে। কেননা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এই যুগে সারা বিশ্বে ইসলামকে জয়যুক্ত করিয়া জগতকে পরিত্রান এবং প্রকৃত সুখ-শান্তি দ্বারা সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যের পূর্ণতার জন্যও আমরা পবিত্র রমজান মাসে দোয়া করিতে থাকি। এজন্য আজ ঈদের দিনে আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের এই দোয়া যে, সেই শুভ দিন শীঘ্র আগমন করুক, যখন সমস্ত জগত হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর পতাকার নীচে একত্রিত হইয়া সত্যিকার খুশী এবং প্রকৃত সুখ-সাচ্ছন্দের অধিকারী হয়।

অতঃপর হুজুর ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ঈদ, তেমনি ভাবে পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক ঈদের মধ্যে পরস্পর প্রভেদ বিশ্লেষণ করার পর বলেন যে, আহ্‌মদীর ঈদ প্রকৃত পক্ষে রূহানী (আধ্যাত্মিক) ঈদই হইয়া থাকে। আহ্‌মদী যেহেতু মানবজাতির সেবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, সেহেতু তাহার ঈদ ইহাই যে, তাহার দোয়া সমূহ কবুল হওয়ার ফলে মানবজাতির জন্য আনন্দের উপকরণ সৃষ্টি হউক। আমাদের আনন্দ সেই ঈদে নিহিত, যাহাতে দেশ সুখে ও শান্তিতে সমৃদ্ধ হয়। যেভাবে আমরা আমাদের রব্বে করীম (মহানুভব খোদা)-এর প্রেম লাভ করিয়াছি, যেভাবে আমাদের রূহ্ (আত্মা) আমাদের রব্বে-করীমের প্রতি প্রণত এবং তাঁহার সন্তোষ ও প্রীতিতে সদা পরিতৃপ্ত ও প্রফুল্ল তেমনি ভাবে আমাদের দেশে বসবাসকারী অন্যান্য সকল মানুষের জন্যও রূহানী খুশীর উপাদান সৃষ্টি হউক। পুণঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ইহা যে, মানবজাতি—যে কোন মহাদেশ বা যে কোন অঞ্চল অথবা যে কোন দ্বীপের অধিবাসীই হউক, মোটকথা যে কোন স্থানের বসবাসকারীই হউক, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন তাহাদের সকলের জন্য খুশী এবং আনন্দের উপকরণ সৃষ্টি করেন। পার্থিব ক্ষমতা লাভের প্রতি আমাদের কোনই আকর্ষণ নাই। আমাদের জন্য চূড়ান্ত ও প্রকৃত এবং সর্বউচ্চ সফলতা ইহাই যে, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন, আমাদের নগণ্য কুরবানী ও প্রচেষ্টাকে কবুল করেন

এবং ইসলামের বিজয় ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সপক্ষে মহান সুফল সমূহ উদ্ভাবিত করেন। আসমানে এই ফায়সালা হইয়া আছে যে, জামাত আহ্‌মদীয়ার দ্বারা ইসলাম দুনিয়াতে প্রাধান্য ও বিজয় লাভ করিবে। (ইনশাআল্লাহ্‌)। এই সম্পর্কে তিনি আমাদিগকে আজীমুশ্‌শান ওয়াদা এবং শুভ-সংবাদ সমূহ প্রদান করিয়াছেন। আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার ওয়াদা সমূহ পূর্ণ হইতেও দেখিয়াছি, আমরা তাঁহার ফজল ও অনুগ্রহরাজী বারিকণার ন্যায় আকাশ হইতে বর্ষিত হইতে দেখিয়াছি এবং আমরা তাঁহার রহমত ও করুণার বিকাশ সমূহ চতুর্দিকে (ছড়াইয়া পড়িতে) প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই জন্য আমরা দুনিয়ার দিকে দৃকপাত করি না। আমাদের দৃষ্টি সর্বদা ও সর্বক্ষণ আমাদের রাব্বে করীম এবং তাঁহার অনুগ্রহরাজীর দিকেই নিবদ্ধ। ইহাতেই আমরা সন্তুষ্ট, প্রফুল্ল; এবং তাঁহারই প্রশংসা-গীতি সর্বদা আমাদের জবানে জারী থাকে।

হুজুর আরও বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা ওয়াদা করিয়াছেন যে, একটি সত্যিকার ও প্রকৃত ঈদ দুনিয়ার জন্য নির্ধারিত করা হইয়াছে এবং উহা এই যে, পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী সমগ্র মানবজাতি খোদাতায়ালার প্রিয়তম রসূল হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পতাকা তলে একত্রিত হইবে এবং সেই দিন সমস্ত মানবজাতির জন্য প্রকৃত এবং পূর্ণ ঈদের দিন হইবে. তাহাদের জন্য চিরস্থায়ী আনন্দের আয়োজন করা হইবে। সেই শুভ দিনকে নিকট হইতে নিকটতর আনয়নের জন্য আমাদের কর্ত্তব্য অধিকতর কুরবানী সমূহ পেশ করা, দোয়া করা এবং মানবজাতির প্রতি প্রেম ও ভালবাসা প্রসারিত করা। খোদাতায়ালা উক্ত সত্যকার এবং পূর্ণ ঈদ আমাদের জীবদ্দশাতেই যেন আমাদের দেখান।

সর্বশেষে হুজুর বলেন, আজ দুইটি ঈদ একত্রিত হইয়াছে, একটি ঈদুল-ফিৎর এবং অপরটি জুমার ঈদ, যাহা প্রত্যেক সপ্তাহে আসে। আমাদের দোয়া করা উচিত, আল্লাহতায়ালা যেন দুইটি রূহানী আনন্দকেও একত্রিত করিয়া দেন। এক রূহানী খুশী ও তৃপ্তি তো আমাদের জন্য. যাহা আমরা আল্লাহতায়ালার ফজলে উপলব্ধি করিতেছি এবং অপরটি সকল মানবজাতির জন্য, যাহা তাহারা তখন লাভ করিবে, যখন সমগ্র মানবজাতি মোহাম্মদ রসূলল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর পতাকার নীচে আসিয়া একত্রিত হইবে। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের সকলকে সত্যিকার খুশী এবং প্রশান্তি লাভের সৌভাগ্য দান করুন এবং আমাদের ভ্রাতাদিগকেও দান করুন। আমীন।

খোৎবা সানীয়ার পর হুজুর সম্মিলিত দোয়া করান এবং সকল বন্ধুকে আর একবার ঈদ মোবারকবাদ প্রদান করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন।

—ওয়া আখেরু দা'ওয়ানা আনেল হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন।

(সাপ্তাহিক 'বদর' (কাদিয়ান) হইতে অনুবাদ)—আহমদ সাদেক মাহমুদ

কুরবানীর তাৎপর্য

[সুরা হজ্জের ৩৫ নং আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত খলিফাতুল মসিহ সানী মুসলেহ মওউদ (রাঃ) তফসীরে কবীর, ৫ম খণ্ডের ১ম অংশে কুরবানী সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ ও ঈমান বর্দ্ধক আলোকপাত করিয়াছেন। নিম্নে উহার একাংশের ভাবানুবাদ পেশ করা গেল]

—আহমদ সাদেক মাহমুদ

কুরআন করীম বলে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার পুত্র ইসমাইলকে জবাই করিতেছেন। উক্ত স্বপ্নের নির্দেশ পালন পূর্বক তিনি হযরত ইসমাইল (আঃ) কে তাঁহার মাতা হযরত হাজেরা (রাঃ) সহ একটি তৃণলতাহীন, অনাবাদ, শুষ্ক পাহাড় অধ্যুষিত মরু প্রান্তরে লইয়া গিয়া আল্লাহ্‌র এক মহান উদ্দেশ্যের পূর্ণতার জন্য ছাড়িয়া দেন এবং এইভাবে নিজ হস্তে মহান কুরবানী পেশ করেন। বাইবেল হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর ঘটনার মধ্যে মনুষ্য কুরবানীকে বাস্তব ঘটনা ও মূল হিসাবে পেশ করে। কিন্তু কুরআন শরীফ শুধু পশু কুরবানীকেই উহার মূল বলিয়া আখ্যাদান করে এবং বলে যে, খাঁটী ধর্মে খোদাতায়ালার তরফ হইতে পশু কুরবানীকেই কুরবানী হিসাবে নির্ধারণ করা হইয়া আসিয়াছে; মনুষ্য কুরবানীর প্রথা মানব ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত হইয়াছে ধর্মের বিকার গ্রস্ত অবস্থায় আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশও ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং ইতিহাসের এই সত্যটি বাইবেলও স্বীকার করে। সুতরাং প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, মনুষ্য কুরবানীর প্রথা যখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছার পরিপন্থি, তখন হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কে স্বপ্নে তাঁহার পুত্রকে তিনি জবাই করিতেছেন বলিয়া কেন দেখান হইয়াছিল? ইহার উত্তর এই যে, উক্ত স্বপ্নের প্রকৃত পক্ষে একটি তাবীর ছিল, যাহা পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর দ্বারা প্রকাশ লাভ করিয়াছে এবং উহা এই ছিল যে, একদিন হযরত ইব্রাহিম (আঃ) তাঁহার পুত্র ইসমাইলকে খোদা-তায়ালার আদেশে এমন এক জায়গায় এমন পরিবেশের মধ্যে ছাড়িয়া আসবেন, যেখানে হযরত ইসমাইলের মৃত্যু (স্বাভাবিক অবস্থায়) সুনিশ্চিত কিন্তু আল্লাহতায়ালা তাঁহার সেই কুরবানীকে কবুল করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষার এবং জীবন নির্বাহের উপকরন সৃষ্টি করিয়া দিবেন এবং তাঁহার দ্বারা আপন প্রাচীনতম এবাদ-তগৃহ—কা'বাশরীফ আবাদ করাইবেন, যাহাতে উহা আল্লাহ্‌তায়ালার মহা পরিকল্পনানুযায়ী দুনিয়ার জন্য আখেরী এবাদত গৃহ হিসাবেও পরিণত হয় এবং আল্লাহ্‌তায়ালা যেমন 'আওয়াল' এবং 'আখের', তেমনি তাঁহার এই বাদত-গৃহও প্রথম এবং শেষ এবাদত গৃহ সাব্যস্ত হয়। সুতরাং মুসলমানগণের মধ্যে বস্তুতঃ কুরবানীর ঈদ এমন কোন ছাগ বা মেষের কুরবানীর স্মৃতি হিসাবে নয়, যাহা হযরত ইব্রাহিম

(আঃ) নিজ হাতে করিয়াছিলেন। বরং ইহা হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর উক্ত কুরবানীর স্মৃতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত, সেই কুরবানী যাহা বয়তুল্লাহ্ শরীফের আবাদীর উদ্দেশ্যে পেশ করা হইয়াছিল এবং ইহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে যে, হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর নিজ পুত্রকে একটি তৃণ-লতাহীন মরু-প্রান্তরে রাখিয়া আসা নিজ হাতে তাহাকে জবাই করারই তুল্য ছিল, বরং প্রকৃত পক্ষে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর কুরবানী ছিল। কেননা জবাই করিলে ত এক মুহূর্তের মধ্যেই প্রাণ নাশ হইয়া যায়, কিন্তু উক্ত অবস্থায় আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ ও ফজল না হইলে হযরত ইসমাইলকে (এবং তাঁহার মাতাকে) তিলে তিলে প্রাণ বিসর্জন দিতে হইত।

সুতরাং হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর উক্ত স্বপ্নের উদ্দেশ্য মনুষ্য কুরবানীর বিকৃত ও নিষিদ্ধ প্রথার সমর্থন ও প্রচলন ছিল না, বরং উহার দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালা দুনিয়াকে এই সবক দিতে চাহিয়াছিলেন যে, আসল কুরবানী ইহা যে, মানুষ যেন দুনিয়ার কিছু সাধনকল্পে দুঃখ ও কষ্ট বরণ করে, ত্যাগ স্বীকার করে। সুতরাং সেই কুরবানীই বা উহার পবিত্র সংকল্পই তাঁহার নিকট কবুল হইতে পারে, যাহা মানবজাতির সঞ্জীবনের কারণ হয়।

কুরবানীর ঈদ এই সবক বহন করে যে, যাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার উদ্দেশ্যে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সহিত জীবনে কুরবানী পেশ করে, চিরকালের জন্য তাহাদিগকে জীবন্ত, রাখা হয়, তাহাদের আদর্শ জীবন্ত তাহাদের স্মৃতি অক্ষয় এবং তাহাদের পুরস্কার অফুরন্ত হইয়া থাকে।

এখানে এই বিষয়টির প্রতিও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা "ওয়া লেকুল্লে উম্মাতেন মানসাকান" বলিয়া কুরবানীর প্রকৃত তত্ত্ব এবং উহার দার্শনিক তাৎপর্যের উপর ও আলোকপাত করিয়াছেন। তাহা এই যে, শুধু কুরবানী কোন কিছুই নহে বরং খোদা তায়ালার দৃষ্টিতে সেই এখলাস আন্তরিকতা ও নিষ্ঠাপূর্ণ আবেগ ও ইচ্ছাই মর্যাদা ও মূল্য লাভ করে, যাহা কুরবানীর পশ্চাতে মানুষের অন্তরে সক্রিয় থাকে। যদি কোন ব্যক্তি উত্তম ধরনের দুম্বা বা ছাগ কুরবানী দেয়, কিন্তু সে তাহাতে আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ করাকে তাহার লক্ষ্যস্থল করে না, তাহা হইলে তাহার সেই কুরবানী খোদাতায়ালার নিকট একটা তৃনখণ্ডের ন্যায়ও মূল্য লাভ করিতে পারে না। এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটি আল্লাহ্‌তায়ালা "মানসাক" শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, যাহার অর্থ কুরবানী, কুরবানীর পদ্ধতি ও কুরবানী করার স্থান ও কাল। ইহা "নাসাকা" হইতে আসিয়াছে এবং "নাসাকা লিল্লাহে"-এর অর্থ এই যে, "তাতাওয়াযা বেকুরবাতেন ওয়া যাবাহা লে ওয়াজহে হি" (আকরাবুল মওয়াবেদ অভিধান) অর্থাৎ কোন নেক কাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং সন্তুষ্ট চিত্তে করা এবং এই খালেস নিয়তের সহিত করা যেন আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ সম্ভব হয়।

(তফসীরে কবীর, ৫ম খণ্ড, ১ম অংশ, পৃঃ ৫০-৫১)

আত্ম-হত্যা

—মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—২)

প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন স্বাধীন কর্মধারায় এক এক পরিণামে উপস্থিত হয়। তদনুযায়ী যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশিত নিয়মাবলী ভঙ্গ করিয়া অথবা আদেশ পালন না করিয়া কোন পরিণামে উপস্থিত হয়, তখন সেই পরিণাম আল্লাহ্‌তায়ালার আইনে ঘটিয়া থাকে বটে এবং পরোক্ষভাবে আল্লাহ্‌তায়ালা সেই ঘটনা ঘটাইয়া থাকেন, কিন্তু দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে অপরাধীর। দৃষ্টান্ত দিলে পাঠক ভালরূপে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বেলা দ্বিপ্রহরে কোন কামরাকে চতুর্দিকে কালো কাপড় দিয়া ঘিরিলে, কামরা অন্ধকার হইবে এবং অন্ধকার আল্লাহ্‌র নিয়মে ঘটিবে, কিন্তু কামরা অন্ধকার করার জন্য দায়িত্ব তাহার যে কামরাকে কালো কাপড় দিয়া ঘিরিয়াছে। তাহার কালো পর্দা সরাইয়া দিলে কামরা আলোকিত হইয়া যাইবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে, সে জীবনের এক পথ বাছিয়া লয়, যাহার পরিণামে সে আত্মহত্যার কোঠায় গিয়া পড়ে। অন্যদিকে যে আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশিত পথে চলে, সে সম্মান ও পুরস্কারের কোঠায় গিয়া পড়ে। আমাদিগকে স্মরন রাখিতে হইবে যে, এই দুই প্রকারের পরিণামের কোন পরিণামে পৌছানোর ব্যাপারে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার বাধাকর হস্ত প্রসারিত করেন না। যদি কিছু করেন, তবে বিশ্বাসীকে বাঁচাইবার জন্য করেন। তিনি বলিয়াছেন :

حقا علينا ننج المؤمنين

"মোমেনগণকে উদ্ধার করা আমাদের দায়িত্ব।" (সূরা ইউনুস—১০ম রুকু)।

তদনুযায়ী অপরাধী ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌-তায়ালার উপর বিশ্বাস আনে এবং তাঁহার দরবারে আত্ম-সমর্পন করে ও সকাতরে ক্ষমার ভিখারী হয়, তাহা হইলে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হইবে এবং তাহার জীবনপথ নিশ্চিতভাবে আলোকিত হইয়া উঠিবে। মানব জীবনে এমন কোনো পাপ নাই যাহা পরম ও চরম আত্ম-সমর্পনে আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে ক্ষমা না হয়। শেখ সাদী (রাঃ)-এর এক প্রার্থনা আছে :

گناه من ار نامدے در شمار
ترا نام کئے بودے امرزگار

আমার পাপ যদি সংখ্যাতীত না হইত?
তোমার নাম কিভাবে ক্ষমাশীল হইত?

পবিত্র কুরআনে আত্মার এই স্বাভাবিক ডাকের জবাবে বলা হইয়াছে :

قل يا عبادى الذين اسرفوا على
انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان
الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور
الرحيم ٥

"বল: হে আমার বান্দাগণ! যাহারা নিজ প্রাণের উপর যুলুম করিয়াছ, আল্লাহ্‌র রহমত লাভ সম্বন্ধে নিরাশ হইও না। আল্লাহ্ সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন। তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সুরা যুমার, ৬ষ্ঠ রুকু)।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিরাশ হয় এবং ক্ষমার বিধানের আশ্রয় গ্রহণ না করে এবং আল্লাহ্‌র রহমতের সদা প্রসারিত হস্তকে প্রত্যাখ্যান করে, সে অন্ধকার, অবিশ্বাস ও পাপজনিত পরিণামের শিকার হইয়া যায়। মানবের কৃত কর্মের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নির্ধারিত বিধান আপন পথে সদা কাজ করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু অনুতাপে ক্ষমা চাহিলে তাঁহার ক্ষমা ও রহমতের বিধান অপর সব বিধানকে ছাইয়া যায়। তাঁহার রহমতের গুণ তাঁহার সকল গুণকে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই সত্য ও তত্ত্বকে উপলব্ধি ও বিশ্বাস না করায় এক পাপী শাস্তি পায় এবং অন্য জন উপলব্ধি ও বিশ্বাস করিয়া বাঁচিয়া যায়। দুই জনের দুই প্রকার ফল কিন্তু প্রত্যেকের ফল স্বোপার্জিত। আল্লাহ্‌তায়ালা কাহারও প্রতি শক্তি প্রয়োগে কাজে ও তাহার ফলে বাধ্য করেন না। সুতরাং যে স্বাভাবিক মৃত্যুতে মরে সেও যেমন নিজ চলার ফলে মরে, যে আত্মহত্যা করে সেও নিজ চলার ফলে মরে। ঠাণ্ডা লাগাইয়া এক জন লোক নিমোনীয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিলে যেমন আমরা এ কথা বলি না যে খোদা তাহাকে নিমোনীয়া রোগে মারিতে বাধ্য করিয়াছেন, তেমনি যে কৃত অন্যায় কর্মের ফলে আত্মহত্যা করিয়া মরে তাহার সম্বন্ধেও আমরা এ কথা বলিতে অধিকারী নহি যে, খোদা তাহাকে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য করিয়াছেন। ইচ্ছাকৃতভাবে কেহ মরিবার উদ্দেশ্যে ঠাণ্ডা লাগাইয়া নিমোনিয়াকে ডাকিয়া আনে না। সেই জন্য এই রোগে মরিলে তাহার অপরাধ নাই। প্রকৃতির নিয়মকে সাময়িক-ভাবে বিস্মৃত হইয়া যে পানীতে বেশী ভিজে এবং নিজ শারীরিক অবস্থার আন্দাজ করিতে পারে না যে, নিমোনীয়া হইবে, সেই জন্য তাহার নিমোনীয়া রোগ হওয়া ইচ্ছাকৃত নহে। যদি কেহ ইচ্ছাকৃত ভাবে মরার উদ্দেশ্যে এইরূপ করে তাহা হইলে সেও আত্মহত্যার জন্য দায়ী হইবে। পক্ষান্তরে সকল বিধানের বিরুদ্ধে এবং সৃষ্টি কর্তার স্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধে যে আত্মহত্যা করে সে স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ করে। খোদা তাহাকে জোর করিয়া আত্মহত্যা করাইয়াছেন এ কথা ঘোর অসত্য। দৈনন্দিন ঘটনায় আমরা দেখি কোন অপরাধী হাতে নাতে ধরা পড়িলে এই কথাই বলে যে এবার ছাড়িয়া দেন, আর এমন কাজ করিব না। সে কখনও একথা বলে না যে, খোদা তাহাকে এ কাজ

করাইয়াছে এবং দোষ তাহার নহে। কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন :

"অতএব যখন তাহাদের (অপরাধীদের) উপর শাস্তি আসিয়া নিপতিত হইল তখন তাহাদের আর কোন কথা ছিল না, পরন্তু এই যে, নিশ্চয় আমরা যালেম ছিলাম।

(সুরা আরাফ-১ম রুকু)।

পক্ষান্তরে অনিচ্ছাকৃত পাপে লিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অপরাধীর অন্তরে পাপ সম্বন্ধে জ্ঞান আসে এবং তখন তাহার আত্মা হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিম্নলিখিত দোওয়া বাহির হয় :

"হে আমার রব! আমরা নিজেদের প্রাণের উপর যুলুম করিয়াছি। যদি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা না কর এবং রহম না কর, তাহা হইলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইব।"

(সুরা আরাফ-২য় রুকু)

এখন আমরা মৃত্যু, উহার ঘটনা ও সময় সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

প্রত্যেক জীবের জন্য মৃত্যু অবধারিত। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন :

"প্রত্যেক প্রাণীকে মরণ বরণ করিতে হইবে।" (সুরা এমরান—১৯শ রুকু)।

প্রত্যেক শ্রেণীর জীবের জন্য মোটামুটি এক এক মেয়াদ নির্ধারিত আছে। মানুষের জন্য জীবনের এক মেয়াদ, গরুর জন্য আর এক মেয়াদ, ছাগলের জন্য আর এক মেয়াদ ইত্যাদি নির্ধারিত আছে। কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন :

"প্রত্যেক উম্মতের জন্য এক নির্ধারিত মেয়াদ আছে।" প্রত্যেক প্রানী জন্ম মুহূর্ত হবতে স্ব স্ব জাতির জন্য নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে যে কোনো সময়ে অবস্থার প্রেক্ষিতে মরিবে, ইহাই খোদাতায়ালার বিধান। সে জন্মের মুহূর্তে মরিতে পারে, এক দিন পার মরিতে পারে, এক বৎসর পরে মরিতে পারে, অথবা তাহার শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত দীর্ঘতম মেয়াদ পর্যন্ত বাঁচিতে পারে। তাহার উর্ধে নহে। এই মেয়াদ কালের সীমার মধ্যে প্রাণীর জীবনের বাড়া কমা হইতে পারে। কিন্তু যখন মৃত্যুর আদেশ কাহারও উপর নাযেল হইয়া যায় এবং উহার লক্ষণাবলী প্রকাশ হইতে থাকে, তখন সাধারণতঃ তাহার আয়ু বর্ধিত করা হয় না পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন :

"যখন তাহাদের মৃত্যুর আদেশ আসিয়া যায়, তখন তাহারা এক মুহূর্তও পিছনে যাইতে পারে না এবং আগেও যাইতে পারে না।

(সুরা আরাফ, ৪র্থ রুকু)

এ ক্ষেত্রেও একটা পথ আছে, উহা হল শাফায়াতের বিধান। ইহাতে পূর্বাহ্নে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হায়াতের জন্য দোওয়া করিবার অনুমতি লইতে হয়। যদি অনুমতি পাওয়া

যায়, তাহা হইলে দোওয়া করা যায় এবং মঞ্জুর হয়। এই বিষয়গুলি এখন আমি কুরআনের আয়াতে নবীগণের উপর এলহাম ও ঘটনাবলীর উল্লেখ দ্বারা প্রমাণ করিব।

অঙ্কের নিয়মাবলীর ছকে যেমন বিভিন্ন প্রকার অঙ্কের সঠিক উত্তর বাহির হইয়া আসে, তেমনি জাগতিক ঘটনাবলীর প্রবাহে ব্যক্তির আমল ধারার ফলশ্রুতিতে তাহার মৃত্যুর দিন, ক্ষণ ও প্রকার নির্ধারিত হইয়া যায়। আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ বিধানে কাহারও কাহারও ক্ষেত্রে ঈদৃশ ফলশ্রুতি বদলাইয়া গিয়া আয়ুর বাড়া কমা হইতে পারে। আল্লাহ্‌-তায়ালা বলিয়াছেন :

"এবং কোন দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত ব্যক্তির আয়ুকে বর্ধিত করা হয় না বা তাহার আয়ুকে কম করা হয় না, পরন্তু সকলই এক বিধান অনুযায়ী হয়। নিশ্চয়, ইহা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ" (সুরা ফাতের—২য় রুকু)।

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর জীবনের শেষ প্রান্তে যখন মুসলমানগণের বহু বিজয়ের সংবাদবাহী সুরা নস্‌র নাযেল হয়, তখন তিনি এই সুরা পাঠান্তে রূপকের ভাষায় নিম্নলিখিত ভাবে তাহার মৃত্যু সংবাদ জানান :

"আল্লাহ্‌র এক বান্দা ছিল। আল্লাহ্‌ তাহাকে বলিলেন, যদি তুমি চাহ আমার নিকট এখন আসিতে পার অথবা আরও কিছুকাল জগতের সংস্কার কার্য করিতে পার। আল্লাহ্‌র বান্দা বলিল, সে প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাওয়াই পছন্দ করে।" এই সংবাদ হইতে সুস্পষ্ট বুঝা গেল, আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে সুযোগ দিয়াছিলেন আরও কিছুকাল বাঁচিবার, কিন্তু তিনি সে সুযোগ গ্রহণ করেন নাই। ফলে এই ঘটনার অল্প কয়েক দিন পরেই তিনি এন্তেকাল করেন। তিনি চাহিলে নিশ্চয় আরও কিছুকাল বাঁচিতে পারিতেন। আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-কেও পূর্বাহ্নে তাঁহার আয়ু সম্বন্ধে জানাইয়াছিলেন যে তাহার আয়ু ৮০ বৎসর হইতে অথবা ৫/৬ বৎসর বেশী অথবা ৫/৬ বৎসর কম হইবে। ইহার ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন, "যদি খোদাতায়ালা চাহেন, তাহা হইলে আমার বয়স ৮০ বৎসর হইতে কিছু বেশী হইতে পারে এবং ওহীর ওয়াদার শাব্দিক অর্থ ধরিলে আয়ু ৭৪ হইতে ৮৬ বৎসরের মধ্যে নির্ধারিত দেখা যায়।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খণ্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা)

সৌর বর্ষের হিসাবে তিনি ৭৪ বৎসর বয়সে এবং চান্দ্র বর্ষের হিসাবে ৭৬ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

উপরে বর্ণিত দুই নবীর আয়ুর সম্বন্ধে এলহাম হইতে ইহা বুঝা গেল যে এক সীমার মধ্যে আয়ু বাড়িতে বা কমিতে পারে।

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "দোওয়া ব্যতিরেকে আর কিছুই বিধিলিপিকে রদ করিতে পারে না এবং সৎ কর্ম ছাড়া আর কিছুই আয়ুকে বর্ধিত করে না। পাপের জন্য মানুষের বরাদ্দ খাদ্য (অর্থাৎ আয়ু) কমিয়া যায়।" (ইবনে মাজা)।

আল্লাহ্‌তায়ালা কোনো কোনো সময় স্বপ্ন যোগে পূর্ব হইতে কাহারও মৃত্যুর সংবাদ দিয়া থাকেন। এ সময় দোওয়া ও সদকা (যাহা পরোক্ষ দোওয়ার রং রাখে) দ্বারা মৃত্যু বিলম্বিত হয়। সদকা করিলে সদকা প্রাপ্ত ব্যক্তি মনে তৃপ্তি উপলব্ধি করে। উহা দোওয়ার আকারে আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারের দিকে উত্থিত ও গৃহীত হয়। জীবনের বদলে জীবন যথা গরু, ছাগল, বা মুরগী যবেহ করিয়া গোস্ত সদকা দিতে হয়। এই গোস্ত মানুষ এবং কাক চিলকে ও খাওয়ান যায়। স্বপ্নে কাহারও মৃত্যুর ইঙ্গিত পাইলে, বিরুদ্ধ ও নিরপেক্ষভাবাপন্ন ব্যক্তিকে না বলিয়া নেক ও বন্ধুভাবাপন্ন ব্যক্তির নিকট বলিতে হয়, যাহাতে উহার ভাল তাবীর ও দোওয়ার দ্বারা মৃত্যু বিলম্বিত হয়। এখানে হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর যামানায় এক সাহাবীর কথা ঘটনা বলিব। মদিনায় এক মুসলমান স্ত্রী লোক স্বপ্নে দেখেন যে জোর বাতাস আসিয়া তাঁহার মাথার কাপড় উড়াইয়া দিল। হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর নিকট তিনি এই স্বপ্ন বর্ণনা করিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন. তাঁহার স্বামী কোথায়? ঐ স্ত্রী লোক বলিলেন, জেহাদে গিয়াছেন হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, তোমার স্বামী জেহাদ হইতে নিরাপদে ফিরিয়া আসিবেন। সত্যই দেখা গেল তিনি জেহাদ হইতে নিরাপদে ফিরিয়া আসিলেন। কিছুদিন পরে আবার ঐ স্ত্রীলোক অনুরূপ স্বপ্ন দেখিলেন এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে নিবেদন করায় তিনি পূর্বের ন্যায় উহার তাবির করিলেন। এবারও ঐ সাহাবী নিরাপদে জেহাদ হইতে ফিরিলেন। তৃতীয় বার আবার ঐ স্ত্রীলোক একই স্বপ্ন দেখিলেন। এবারও তাহার স্বামী জেহাদে গিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ স্ত্রীলোক হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পরিবর্তে এবার হযরত উমর (রাঃ)-কে পাইয়া তাঁহাকে স্বপ্ন শুনাইলেন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার স্বামী কোথায়? তিনি বলিলেন, তিনি জেহাদে গিয়াছেন। হযরত উমর (রাঃ) বলিলেন, তিনি শহীদ হইবেন। ঠিক এমনি সময়ে হযরত রসুল করীম (সাঃ) আসিয়া হযরত উমর (রাঃ)-এর কথা শুনিলেন। তিনি হযরত উমর (রাঃ) কে তিরস্কার করিলেন যে তিনি কেন স্বপ্নের সদিচ্ছা জ্ঞাপক ভাল তাবীর করিলেন না। কয়েকদিন পরেই খবর আসিল যে সেই সাহাবী শহীদ হইয়া গিয়াছেন। যেহেতু সাহাবীগণ

সকলেই শহীদ হইবার বড়ই আগ্রহ রাখিতেন এই জন্য ঐ সাহাবীর সম্বন্ধে তাঁহার স্ত্রী তাঁহার শাহাদতের সংবাদ পাইতেছিলেন কিন্তু দুইবার হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর দোওয়া-পূর্ণ তাবীরের কারণে মৃত্যু টলিয়া যাইতেছিল। তৃতীয়বারও টলিয়া যাইত, যদি অনুরূপ তাবির করা হইত। যদি তাহা না হইত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) হযরত উমর (রাঃ) কে তিরস্কার করিতেন না এবং উহার সদিচ্ছা জ্ঞাপক তাবীর করার বিষয় বলিতেন না। এই ঘটনা হইতে সকলের সবক গ্রহণ করা উচিৎ যে, খারাপ স্বপ্ন দেখিলে মন্দ তাবীর না করা ও দোওয়া করা কর্তব্য। ইহাতে বিপদ বিলম্বিত হইয়া যায় এবং মৃত্যুর প্রকারও বদলাইতে পারে সকল সাহাবীর শাহাদতের তীব্র আকাঙ্খার কথা জানা থাকার কারণে হযরত উমর (রাঃ) স্বপ্নের তাবীর শাহাদত করিয়াছিলেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে ঘটিলও উহাই। অন্যরূপ তাবীর ও ইচ্ছা প্রকাশ ও দোওয়া করিলে অন্যরূপ ঘটিত।

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন, "যদি এমন হয় যে বিপদ নাযেল হইতেছে যদ্বারা মৃত্যুর লক্ষণাবলী প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে এমন সময়ে আল্লাহ্‌তায়ালার নিয়ম এই যে এই বিপদ বিলম্বিত হয় না এবং এইরূপ সময়ে খোদার যাঁহারা মকবুল, তাঁহাদের আদব এই যে তাঁহারা যেন দোওয়া পরিত্যাগ করিয়া দেন এবং ধৈর্য ধারন করেন। দোওয়ার উত্তম সময় তখন যখন নৈরাশ্যের পূর্ণ উপকরণ প্রকাশিত হয় নাই এবং লক্ষণাবলী দেখা দেয় নাই, যাহা দ্বারা বুঝা যায় যে, এখন বিপদ দরজায় আসিয়া হাজির হইয়াছে এবং এক প্রকার ইহা নাযেল হইয়া গিয়াছে। কারণ ইহাই সুন্নত যে আল্লাহ্‌তায়ালা যখন কোন আযাবকে নাযেল করার ইচ্ছাকে প্রকাশ করিয়া ফেলেন তখন তিনি নিজ ইচ্ছাকে ফিরাইয়া লয়েন না।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খণ্ড—১৮ পৃষ্ঠা)।

উপরুক্ত সময়েও আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে দোওয়া করিলে, বিপদ টলিয়া যায়। এ সম্বন্ধে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এর জীবনের দুইটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। একটি ঘটনায় অনুমতি সাপেক্ষ এবং অপরটিতে বিনা অনুমতিতে মৃত্যু টলিয়া যায়।

"মালের কোটলার রইস নওয়াব মোহাম্মদ আলী খান সাহেবের পুত্র আবদুর রহীম খান এক সাংঘাতিক জ্বর পীড়ায় আক্রান্ত হয় এবং আরোগ্যের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছিল না। সে দেখিতে মৃতবৎ হইয়া গিয়াছিল। সেই সময়ে আমি তাহার জন্য দোওয়া করিলে বুঝিলাম যে আদেশ অবধারিতের দিকে গিয়াছে। তখন আমি

বলিলাম, ইয়া ইলাহী, আমি ইহার আয়ুর জন্য তোমার নিকট শাফাআত করিতেছি। ইহার উত্তরে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিলেন :

অর্থাৎ "কে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে শাফাআত করিতে পারে ?" তখন আমি নীরব হইয়া গেলাম। অতঃপর সঙ্গে সঙ্গে এলহাম হইল :

"তোমাকে শাফাআত করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।" তখন আমি সকাতরে ও বিগলিত অন্তরের সহিত দোওয়া করিতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। খোদা আমার দোওয়া কবুল করিলেন। বালক যেন কবর হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং তাহার আরোগ্যের লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। বালকটি একান্ত জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। দীর্ঘ সময় পরে সে লুপ্ত স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায় এবং সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। সে এখন জীবিত আছে।"

(বারাহীনে আহমদীয়া প্রথম খণ্ড ২১৯—২২০ পৃষ্ঠা)।

"কবুলীয়তে দোওয়ার একটি ঘটনা, যাহাকে মৃতের জীবিত হওয়া বলা যাইতে পারে। ঘটনাটি এইরূপ—দাক্ষিনাত্যের হায়দরাবাদ শহরের আব্দুর রহমান সাহেবের পুত্র আব্দুল করিম নামে একটি বালক আমাদের মাদ্রাসার ছাত্র। ঘটনাক্রমে তাহাকে একটি পাগলা কুকুরে কামড়ায়। চিকিৎসার জন্য তাহাকে কসৌলী হাসপাতালে পাঠান হয়। সেখানে কিছুদিন ধরিয়া চিকিৎসার পর সে কাদিয়ান ফিরিয়া আসিল। কিছুদিন অতীত হইবার পর তাহার জলাতঙ্ক রোগ দেখা দিল। পানি দেখিয়া সে ভয় করিতে লাগিল এবং তাহার ভীতিপ্রদ অবস্থার সৃষ্টি হইল। বেচারা এই প্রবাসী বালকটির জন্য আমার হৃদয় অত্যন্ত বিচলিত হইল এবং দোওয়ার জন্য মনে এক বিশেষ মনোযোগের সৃষ্টি হইল। সকলেই মনে করিতেছিল যে, সে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা যাইবে। লাচার হইয়া তাহাকে বোর্ডিং হইতে বাহির করিয়া এক পৃথক ঘরে অন্যদের নিকট হইতে পৃথক করিয়া অত্যন্ত সতর্কতার সহিত রাখা হইল। কৌসলীর ইংরাজ ডাক্তারদিগকে তাহার চিকিৎসার জন্য তার দেওয়া হইল। উত্তর আসিল, Sorry Nothing can be done for Abdul Karim অর্থাৎ "দুঃখিত। আব্দুল করিমের জন্য করিবার কিছুই নাই।" কিন্তু বিদেশী এই ছেলেটির জন্য আমার হৃদয়ে বড়ই মমতা বোধ হইল এবং বন্ধুগণও তাহার জন্য দোওয়া করিবার নিমিত্ত বড়ই জোর দিল। কারণ একদিকে বালকটির প্রবাসী অবস্থার জন্য সে কৃপার পাত্র ছিল এবং অপরদিকে এক এই ভীতি ছিল যে, যদি সে মরিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার মৃত্যুকে উপলক্ষ করিয়া শত্রুগণ শোরগোল করিবে। তখন আমার হৃদয় তাহার জন্য বড়ই ব্যাকুল ও উদ্বেলিত হইল

এবং তাহার জন্য দোওয়ার এমন অভূতপূর্ব মনোযোগের সৃষ্টি হইল, যাহা কেহ চেষ্টা করিয়া আনিতে পারে না। এরূপ মনোযোগ কেবল খোদার তরফ হইতেই সৃষ্টি হয় এবং যখন এরূপ মনোযোগের সৃষ্টি হয়, তখন আল্লহতায়ালার অনুমতিতে উহা ক্রিয়া দেখায়। ইহার দ্বারা মৃত-প্রায় ব্যক্তি জীবিত হইয়া যায়। বালকটির জন্য মহেন্দ্র ক্ষণের সুযোগ উপস্থিত হইল, মনোযোগ চরমে পৌছিল এবং হৃদয় তাহার জন্য বেদনায় আপ্লুত হইয়া গেল। তখন সেই রোগীর উপর যে মরনের মুখে ঝুলিতেছিল, দোওয়ার ক্রিয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইতিপূর্বে সে পানি দেখিয়া ভয় খাইতেছিল, আলো দেখিয়া পলাইতেছিল। সহসা তাহার অবস্থা অরেগ্যের দিকে ঘুরিল। সে বলিল, এখন আর আমাকে পানি দেখিয়া ভয় লাগে না। অতঃপর সহজভাবে সে পানি লইয়া পান করিল এবং পানি দিয়া ওযু করিয়া সে নামায পড়িল। তাহার ভীতি ও উন্মাদ অবস্থা সম্পুর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া সে সারা রত্রি একটানা ঘুমাইল। কয়েকদিনের মধ্যে সে সুস্থ হইয়া গেল।" হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) যখন দোওয়া করেন, তখন তাহার মনে এক 'এলহাম' হয় যে অমুক ঔষধ রুগীকে পান করাও। তদনুযায়ী ঐ ঔষধ তাহাকে কয়েকবার পান করান হয়। এইভাবে, যে রোগ কখনও সারে না এবং যে রোগে আক্রান্ত হইলে ডাক্তারী শাস্ত্রানুযায়ী রুগীর মৃত্যু সুনিশ্চিত, সেরূপ ক্ষেত্রেও দোয়ার দ্বারা রুগী জীবন পাইল। (বারাহীনে আহমদীয়া, প্রথম খণ্ড, ৪৬-৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

বিশেষ করিয়া সুরা জুমার মধ্যে কাফের গণকে মোবাহেলায় আহ্বান করার যে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, অবিশ্বাসীগণ মোবাহেলায় আসিলে, তাহাদিগের আয়ু কাটিয়া দেওয়া হয় এবং নবীগণকে সুযোগ দেওয়া হয় বর্ধিত আয়ু লাভ করিয়া আরও বেশী সংস্কারের কাজ করার। হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) ডিপুটি আব্দুল্লাহ আথম এবং লেখরামের সহিত মোবাহেলা করিয়াছিলেন। ডিপুটি আব্দুল্লাহ আথম সাময়িকভাবে নিজেকে সংশোধন করায়, সে প্রথম ১৫ মাসের মেয়াদের মধ্যে সে মারা যায় নাই, কিন্তু প্রথম ১৫ মাসের মেয়াদশেষে সে পুনঃ মন্দ আচরনে ফিরিয়া গিয়া হযরত নবী করিম (সাঃ)-কে গালি-গালাজ করিতে থাকে। ইহাতে সে দ্বিতীয় ১৫ মাসের মেয়াদের মধ্যে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর তাহার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সম্মুখে মারা যায়। কিন্তু লেখরাম হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রতি গালি-গালাজ বর্ধিত আকারে করিতে থাকায় সে ৬ বৎসরের মধ্যে, মেয়াদ পুরা হইবার

এক বৎসর বাকী থাকিতে অর্থাৎ ৫ বৎসরেই মারা যায়। এইভাবে বিরুদ্ধবাদীগণকে তাহাদের আয়ু কাটিয়া মেয়াদ কালের মধ্যেও কমবেশী করার সম্বন্ধে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) লিখিয়াছেন।

"আব্দুল্লাহ আথমের সম্বন্ধেও মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। কিন্তু আব্দুল্লাহ আথম বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করার কারণে, তাহার মৃত্যু আসল মেয়াদের কয়েকমাস পরে ঘটে এবং লেখরাম ভবিষ্যদ্বাণীর পর বাড়াবাড়ি করে এবং আমাদের নবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বাজারে ও সভাসমিতিতে গালি-গালাজ করে। সেইজন্য তাহার আসল মেয়াদ পূর্ণ হইবার পূর্বেই সে গ্রেপ্তার হইয়া যায় এবং আরও এক বৎসর বাকী থাকিতে সে মারা যায়। আব্দুল্লাহ আথমের ঘটনায় আল্লাহতায়ালার জামালী গুণের প্রকাশ হয় এবং লেখরামের ঘটনায় জালালী গুণের প্রকাশ হয়। তিনি কাদের, বেশীও করিতে পারেন এবং কমও করিতে পারেন।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খণ্ড ১৮৬ পৃষ্ঠা)

লেখরাম সম্বন্ধে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) আরও লিখিয়াছেন. "যদিও লেখরামের ব্যাপারে আমি এইজন্য আনন্দিত যে খোদাতায়ালার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু অন্যদিকে আমি দুঃখিত যে উদগত যৌবনেই সে মারা যায়। যদি সে আমার দিকে রুজু করিত, তাহা হইলে আমি তাহার জন্য দোয়া করিতাম যেন তাহার বিপদ কাটিয়া যায়। বিপদ কাটাইবার জন্য তাহার মুসলমান হওয়া প্রয়োজন ছিল না, বরং প্রয়োজন ছিল যে সে হযরত রসুল (সাঃ)-কে গালি-গালাজ হইতে বিরত থাকিত,

(বারাহীনে আহমদীয়া, ১ম খণ্ড ২৮৯ পৃঃ)।

সুতরাং উপরের আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, মৃত্যুর কোন ক্ষণ অটল ভাবে নির্ধারিত নাই। মোটামুটি একটা মেয়াদ আছে। উহার মধ্যে আয়ু দোওয়া ও নেক কাজের দ্বারা বাড়িতে পারে এবং পাপ কাজের দ্বারা কমিতে পারে। অনুরূপভাবে আযাবের আকারের মৃত্যুও সাধারণ প্রকারের মৃত্যুতে পরিবর্তিত হইতে পারে।

হযরত ইউনুস (আঃ)-এর জাতি পাপাচারিতা ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার ও তাঁহার বিরোধীতা করার জন্য আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে ৪০ দিনের মধ্যে শাস্তি দিবার ফয়সালা জানান। কিন্তু ৪০ তম দিবস যখন আযাবের লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল, তখন সারা জাতি সম্মিলিত ভাবে আল্লাহতায়ালার নিকট এস্তেগফার ও কান্নাকাটি করায় নির্ধারিত আযাব টলিয়া যায়। ইহা শুধু কাহিনী নহে বরং ইহা আল্লাহতায়ালার এক বিধান। তিনি বড়ই করুনাশীল। তাই তিনি মানবজাতিকে উক্ত

জাতির দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া তাঁহার নির্ধারিত আযাব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বড়ই মর্মস্পর্শী ভাষায় সাধারণ ভাবে আহ্বান জানাইয়াছেন।

"অন্য আর কোন শহর কেন হইল না, ইউনুসের কওম ছাড়া, যাহারা ঈমান আনিয়া উপকৃত হইত? যখন তাহারা (ইউনুস (আঃ)-এর কওম) ঈমান আনিল, আমরা তাহাদিগের উপর হইতে ইহ জীবনে লাঞ্ছনা-জনক আযাব অপসারিত করিয়া দিলাম এবং তাহাদিগকে এক মেয়াদ পর্যন্ত উপজীবিকা দিলাম।" (সুরা ইউনুস ১০ম রুকু)। এই আয়াত এবং আয়াত উল্লিখিত ঘটনার দ্বারা ইহাই সপ্রমানিত হয় যে দোওয়ার দ্বারা মৃত্যুর সময় এবং প্রকার বদলাইয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর কওম আরবগণও এই বিধানে আযাব হইতে বাঁচিয়া যায়। হযরত ইউনুস (আঃ) এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর কওম আযাবের এক আঘাতে একই সঙ্গে এক প্রকারের মৃত্যুর হাত এড়াইয়া স্বাভাবিক জীবনের স্রোতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারে মৃত্যু লাভ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান যামানার মানব জাতি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর দাস যুগ নবী হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এর ডাকে সাড়া দিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভে মোটেই যত্নবান নহে। তাহারাও আত্মহত্যার পথের অনুসরণ করিতেছে। আলোকময় জীবনের পথকে উপেক্ষা করিয়া তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার আযাবকে দাওয়াত দিতেছে। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার বান্দাগণকে সুমতি দিন এবং তাহারা হেদায়েত লাভ করুক।

পবিত্র কুরআনের কতকগুলি আয়াতের ভুল অর্থ করিয়া অনেকে বিভ্রান্ত হইয়া এই ধারনায় উপনীত হয় যে মানুষ অসহায় এবং তাহার জন্য মৃত্যুর সময় ও প্রকার নির্ধারিত আছে। এই প্রকারের আয়াতগুলির সঠী অর্থ হযরত খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ) তাঁহার পুস্তক তকদীরে ইলাহী পুস্তকে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়া সকল ভ্রান্তি দুর করিয়া দিয়াছেন। এখানে নমুনা স্বরূপ আমি একটি আয়াতের আলোচনা করিব। উহোদের যুদ্ধের সময় যখন মুনাফেকের একদল মুসলমানদিগের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তখনকার অবস্থার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন:

"মুনাফেকদের বলিয়া দাও, যদি তোমরা (মোমেনগণ) যুদ্ধক্ষেত্রে না থাকিয়া নিজ নিজ ঘরেও থাকিতে তথাপি ঐ সকল লোক যাহাদের সম্বন্ধে কতলের (যুদ্ধের) ফয়সালা করা হইয়াছিল, তাহারা (মোমেনগণ) তাহাদের কতল হওয়ার জায়গা অভিমুখে গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িত।" (সুরা এমরান, ১৬শ রুকু)। এই আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে মুনাফেকদের দুষ্টামীর দ্বারা মোমেনগণ

বিভ্রান্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করা দূরে যাউক, তাহাদের উপর যেহেতু জেহাদ ফরয করা হইয়াছে, তাহারা আপন নিরাপদ গৃহে অবস্থিত থাকিলেও তাহারা আল্লাহ্‌র আদেশ পালনার্থে কাফেরগণের সহিত মোকাবেলা করিবার জন্য নির্ভিক চিত্তে আপন আপন গৃহ হইতে শহীদ হইবার জন্য বাহির হইত।"

(তকদীরে ইলাহী পুস্তক ৩২—৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

কসাই যেভাবে পশু পালকে কিলখানার দিকে তাড়াইয়া লইয়া যায়, উপরুক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা সেই ভাবে মোমেনগণকে বধ্য-ভূমির দিকে বাধ্য করিয়া হাঁকাইয়া লইয়া যাওয়ার কথা বলেন নাই। বরং উপরুক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা মোমেনগণের উচ্চ মর্যাদার উল্লেখ করিয়াছেন যে, কিভাবে ঐশী প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহারা আত্ম-সুখ ও স্বাচ্ছন্দকে তুচ্ছ করিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদা প্রাণ দিবার উদ্দেশ্যে জেহাদের ময়দানে যাত্রা করিতে প্রস্তুত থাকে। যাঁহারা শহীদ হয়েন তাঁহাদের নাম ইহলোকেও চির উজ্জ্বল থাকে এবং পরলোকেও তাঁহারা আল্লাহ্‌র পুরস্কারে ভূষিত হয়েন। কিন্তু যাহারা আত্মহত্যা করে তাহাদের জীবন ইহলোকেও নিস্ফল এবং পরকালেও অন্ধকার।

শোক সংবাদ

(১)

দুঃখের সহিত আমরা জানাইতেছি যে, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সাবডিবিশন অন্তর্গত ক্রোড়া আঞ্জুমান আহমদীয়ার প্রবীন আহ্‌মদী জনাব মাষ্টার আবদুল আজিজ সাহেব গতকাল ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭৪ইং ঢাকা মহাখালী হাসপাতালে এন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে·····রাজেউন। তাঁহার বয়স প্রায় ৮০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি তাঁহার অবসরপ্রাপ্ত জীবনের শেষ কয়েক বৎসর হইতে আমৃত্যু জামাতের ওয়াকফে জাদীদ নেজামের অধীনে মোয়াল্লেম হিসাবে দীনের খেদমত করিয়া যাইতেছিলেন। তিনি এক স্ত্রী ৬ ছেলে ৬ মেয়ে এবং বহু নাতি-নাতনী রাখিয়া যান। আল্লাহ্‌তায়ালা মরহুমের রূহের মাগফেরাত করুন, তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবার বর্গকে সবর দান করুন এবং সকলের হাফেজ ও নাসের হউন। আমীন।

(২)

জনাব আবদুল জব্বার ভূঞা সাহেবের স্ত্রী ১৭ই নভেম্বর ১৯৭৪ইং তাঁহার নিজ গ্রাম ক্রোড়ায় এন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে ·····রাজেউন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল ৪১ বৎসর। তিনি তিন ছেলে এবং তিন মেয়ে রাখিয়া যান। আল্লাহ্‌তায়ালা মরহুমার আত্মার মাগফেরাত করুন এবং জনাব ভূঞা সাহেব ও অন্যান্য সকল শোক সন্তপ্ত পরিবার বর্গকে সবর ও ধৈর্যের তৌফিক দান করুন এবং সকলের হাফেজ ও নাসের হউন। আমীন।

এ যুগের আস্‌হাবে কাহাফ

—ইবনে সাবিল

পবিত্র কুরআনের সুরা কাহাফে আস্‌হাবে কাহাফ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। আস্‌হাবে কাহাফ অর্থ গুহার অধিবাসী। আস্‌হাবে কাহাফ ঐ সকল খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন যাঁরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগে অর্থাৎ খৃষ্টীয় প্রথম তিন শতাব্দী পর্যন্ত রোমান সম্রাটদের দ্বারা নিপীড়িত ও নির্যাতিত হয়েছিলেন। রোমান সম্রাটগণের মধ্যে সম্রাট নিরো, ডমিনিশিয়ান, ট্রাজন, মার্কাস অরেলিয়াস, ডেসিয়াস এবং ডাইক্লোয়শিয়ানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময়কার অত্যাচারের ঘটনাগুলো অত্যন্ত লোমহর্ষক ছিল। ক্ষুধার্ত সিংহ, ব্যাঘ্র ও অন্যান্য হিংস্র বন্য জন্তুর সামনে অনাহার ক্লিষ্ট, দুর্বল ও বন্দী অবস্থায় খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদেক নিক্ষেপ করা হতো। যখন প্রাথমিক যুগের খৃষ্টানগণ দেখলেন যে, তথাকথিত মানব সমাজে তাদের মাথা লুকাবার জায়গা নেই, তখন তাঁরা মাটির নীচে গুহায় গমন করলেন। অত্যাচারী বিরুদ্ধবাদী দীর্ঘ আলখাল্লা পরিহিত ধর্মনেতাগণ অপেক্ষা পার্বত্য গুহার শ্বাপদ-সংকুল কষ্টকর জীবন তাঁদের নিকট কম ক্ষতিকর ছিল। প্রাথমিক যুগের খৃষ্টানদের উপর পাশবিক অত্যাচারের কাহিনী প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনারূপে ইতিহাসের পুস্তকাবলীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (Encyclopaedia Britanica— under 'Catacombs, ; Story of Rome by Nerwood Young; Roman Empire by Gibbon দ্রষ্টব্য)। রোমান সম্রাট কনষ্টানটাইন খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে খৃষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করে ইহাকে রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে ঘোষণা করার ফলে খৃষ্টানদের উপর অত্যাচারের অবসান হয়। (Encyclopaedia Britanica, 14th Ed. Vol, 5)।

ধর্মের জন্য এবং সত্যের জন্য যুগে যুগে নিরীহ এবং শান্তিপ্রিয় মানুষ অত্যাচারী উগ্রপন্থীদের দ্বারা নিগৃহিত এবং নির্যাতিত হয়েছে। এই অত্যাচারের কাহিনী সুদূর অতীতেও সংঘটিত হয়েছে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগেও হয়েছে, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর সময়েও হয়েছে, এবং আজও অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর অনুসারীগণ আস্‌হাবে কাহাফ হবেন বলে হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এই হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। (হাফিজ জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান সিউতি প্রণীত 'দুররে মনসুর' শীর্ষক কুরআনের তফসির দ্রষ্টব্য)।

কোন সত্য ধর্ম কখনই অত্যাচারের শিক্ষা দেয় নাই, এবং দিতেও পারে না। যারা

ধর্মীয় মতভেদ দূর করার জন্য অত্যাচার-নীতি অনুসরণ করে তারা ধর্মের নামে অধর্ম করে, তারা ধার্মিক পদ-বাচ্য হতেই পারে না। কারন কোন ধর্মই অত্যাচারের শিক্ষা দেয় নাই। পূর্ণতম ধর্ম শান্তির ধর্ম ইসলাম কখনই অত্যাচার ও নিপীড়ণের শিক্ষা দেয় নাই। আল্লাহ্‌তায়'লা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করেছেন : "ওয়াল্লাহু লা ইউহেব্বুয যালেমীন" অর্থাৎ 'আল্লাহ যালেম বা অত্যাচারীকে ভালবাসেন না' (সূরা আল-ইমরান : ১৪১)। হযরত রসুল করীম (সাঃ) সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হলো : "ওমা আরসালনাকা ইল্লা রহমাতুল্লিল আলামীন" অর্থাৎ 'হে রসুল, সারা বিশ্বের রহমত রূপেই তুমি প্রেরিত হইয়াছ।' (সূরা আম্বিয়া)। পবিত্র কুরআন হতে অথবা হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর পবিত্র জীবনাদর্শ হতে এমন একটি দৃষ্টান্তও কেহ দেখাতে পারবেনা যে ইসলাম অত্যাচার ও নির্যাতনের শিক্ষা দিয়েছে। ইসলামের সর্বজন-বিদিত সুমহান শিক্ষা হলো : "লা ইকরাহা ফিদ্দিনে কাদ তাবাইনার রুশ্‌দু মিনাল গাইয়ে" অর্থাৎ ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যোর-জবরদস্তি নিষিদ্ধ। সরল পথ এবং ভ্রান্তির মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।' (সুরা বাকারা : ২৫৭)। বস্তুতঃ কুরআন করীমের পাতায় পাতায় এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর জীবনের প্রতিটি দিনের ঘটনার মধ্যে ইসলামের এই সুমহান নীতি-দর্শনই উদঘাটিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ধর্মীয় স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে: "ঘোষণা কর সত্য যাহা তোমাদের স্রষ্টা ও প্রতি-পালকের নিকট হইতে আসিয়াছে, এখন ঈমান আনা, না আনা তোমাদের ইচ্ছাধীন।" (সুরা কাহাফ : ৩০)। বিদায় হজ্জের পবিত্র সমাগমে হযরত রসুল করীম (সাঃ) মানবীয় অধিকার ও মর্যাদা বোধের এক অপূর্ব আদর্শের প্রতিষ্ঠাকল্পে ঘোষণা করেন : "সকল মানুষ সে—কোন জাতি বা বংশেরই হোক না কেন অথবা জীবন ধারণের যে কোন স্তরেরই অন্তর্ভূক্ত হোক না কেন—সবাই সমান।" তিনি আরো বলেছেন : "সাবধান! কোন মানুষের উপর অত্যাচার করো না। অত্যাচার করো না!" এই গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে তিনি প্রত্যেক মানুষের জান, মাল ও সম্মানকে পবিত্র সম্পদরূপে সম্মান দেখাতে নির্দেশ দিয়েছেন। এক কথায় ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম, মানবতার ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার ধর্ম। (অসমাপ্ত)

ভাল মিষ্টির একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মিষ্টি ঘর

৫৪, কাতালগঞ্জ পাঁচলাইন, চট্টগ্রাম

ফোন—৮৬৪৯৭

কাদিয়ান এবং রবওয়ার সালানা জলসা

এ বারের তিন দিবস ব্যাপী কাদিয়ানের সালানা জলসা ১৩ই, ডিসেম্বর শুরু হইয়াছে এবং ২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর রবওয়ায় সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। উভয় জলসার বিশেষ কামিয়াবীর জন্য বন্ধুদের খাসভাবে দোয়ার অনুরোধ করা যাইতেছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের আমীর মোহতরম মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব, ঢাকা জামাত হইতে জনাব আলী কাশেম খাঁন চৌধুরী ও জনাব এ, টি, এম, আবেদ সাহেব, চট্টগ্রাম হইতে সেই জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেব ও মাহমুদুল হাসান (বদরুদ্দীন সাহেবের পুত্র) এবং নারায়নগঞ্জ জামাতের জনাব আব্দুল করিম সাহেব কাদিয়ানের জলসায় শরীক হইয়াছেন। তাঁহাদের সকলের নিরাপত্তা ও জলসায় যোগদানের পর মঙ্গল মত স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন তজ্জন্য খাসভাবে দোয়ার অনুরোধ করা যাইতেছে।

এবার যাঁহারা হজ্জে গিয়াছেন, তাঁহাদের জন্যও বিশেষভাবে দোয়া জারি রাখিবেন।

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা

আগামী ১৪ ১৫, ও ১৬ই মার্চ, ১৯৭৫ইং সাল মোতাবেক শনি, রবি ও সোমবারে ৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকাস্থ তবলীগ দারুত প্রাঙ্গনে বাংলাদেশ আঞ্জুমনে আহমদীয়ার ৫২তম সালানা জলসা হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ এর অনুমোদন সাপেক্ষে অনুষ্ঠিত হইবে। ইনশাল্লাহ্। আপনারা অবগত আছেন যে. এ বৎসর প্রতিটি জিনিষের দাম গত বৎসরের তুলনায় অনেকগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে এ বারের জলসায় আনুসাঙ্গিক খরচ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ধার্য করা হইয়াছে। তাই জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের নিকট আবেদন করা যাইতেছে যে, আপনারা এই জলসাকে পূর্ণ কামিয়াব করার জন্য সাধ্যানুসারে চাঁদা দান করিবেন। এবং এই মোবারক জলসার কামিয়াবীর জন্য খাসভাবে দোয়া করিবেন।

এবারের জলসায় অংশ গ্রহণ করার জন্য কাদিয়ান হইতে মোহতরম সাহেবজাদা মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেব সহ আরও দুইজন মুরুব্বি সাহেবকে দাওয়াত দেওয়া হইয়াছে, আশা করি তাঁহারা আমাদের জলসায় যোগদান করিবেন। আপনারা বেশী সংখ্যায় জলসায় শরীক হইবেন এবং এই আধ্যাত্মিক সম্মেলনের অপরিসীম কল্যাণ ও সওয়াব হাসিলে যত্নবান হইবেন।

ওয়াকফে জদীদ

ডিসেম্বর মাসেই ওয়াকফ জদীদের মালী সাল শেষ হইতেছে। বন্ধুগণ তৎপর হউন এবং নিজ জমাতের চাঁদা আদায় করতঃ ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে অত্র অফিসে পাঠাইয়া ছওয়াবের ভাগী উন। নবজাত শিশু হইতে অনুর্দ্ধ পনের বৎসরের সকল বালক ও বালিকার পক্ষ হইতেও উক্ত চাঁদা আদায়ে বিশেষভাবে যত্নবান হইবেন। জানুয়ারী মাসের মধ্যে নূতন বৎসরের ওয়াদা গ্রহণ করিয়া কেন্দ্রীয় অফিসে পাঠাইবার জন্যও অনুরোধ করা যাইতেছে।

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন:

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং আমাদের নেতা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং তাহার সহিত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সম্পূর্ণভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিড়িয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"—

(অর্থাৎ—"সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ")

(আইয়ামুস্ সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283035
Editor: A. H. Muhammad Ali Anwar.